Natun Manab Samaj : A collection
of articles by Rahula Sankrityayana

তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬৭

অনুবাদ-স্বত্ব
দীপ্তি হালদার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সত্যপ্রিয় বড়ুয়া

প্রকাশক
অশোক ঘোষ
বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স
১/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
হারাধন ঘোষ
বীণাপাণি প্রেস
২ ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অনুবাদকের কথা

১৯৩৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, আমওয়ারী কিষাণ-সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করার সময় জমিদারের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে আহত হয়ে রাহুল গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রথমে সিওয়ান জেলে, পরে কোমরে দড়ি বেঁধে রাহুলকে ছাপরা জেলে আনা হয়। সেখানে ১৪ মার্চ 'তুম্‌হারী ক্ষয়' লিখতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন দাবি নিয়ে অনশন ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে, ২০ মার্চ রচনাটি শেষ করেন। প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক ও শোষণ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে না পারলে 'নতুন মানব সমাজ' গড়ে তোলা সম্ভব নয়। রাহুল এই ছোট্ট বইটির মধ্য দিয়ে গভীর ক্ষোভের সাথে জ্বলন্ত ভাষায় দেশাচারের নামে প্রচলিত অন্যায় ধ্যান-ধারণাকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন, এবং সেই সঙ্গে এর ধ্বংস কামনা করেছেন।

গ্রন্থশেষে রাহুলের জীবনযাত্রার পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জীও যোগ করা হয়েছে।

কোনোরূপ কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা না রেখেই ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা অনুবাদ আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন ও বন্ধুবর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বই প্রকাশের ব্যাপারে সব রকম সহায়তা করেছেন। বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতি দেবার জন্য শ্রদ্ধেয়া কমলা সাংকৃত্যায়নকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

২৬ চৈত্র ১৩৬৭

শম্ভুনাথ দাস

নতুন মানব সমাজ

স মা জ

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ ও অন্য পশুর মধ্যে পার্থক্য এই যে মানুষ আপন শুভাশুভের জন্য সমাজের উপর অধিকতর নির্ভরশীল। প্রাণীজগতে অতিকায় শক্তিশালী শত্রু ও সময়ে সময়ে বিপর্যয়ঘটিত হিমযুগের ন্যায় প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা করিতে মানুষের বুদ্ধি যাহা করিয়াছে, তাহাকে বিরাট সহায়তা দিয়াছে তাহার সামাজিক সংগঠন। সমাজ প্রথমে দুর্বল মানুষের শক্তিকে শত শত মানুষের একতা দ্বারা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। এই কারণেই মানুষ প্রাকৃতিক ও অপরাপর শত্রুর কবল হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু যে-সমাজ মানুষকে বহির্জগতের বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে সেই সমাজই আজ তাহার সংগঠনের মধ্য হইতেই এরূপ শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছে যাহা মনুষ্য-জীবনকে বহিঃশত্রু অপেক্ষা অধিকতর নরকতুল্য করিয়া তুলিয়াছে।

সমাজের প্রথম কর্তব্য হইতেছে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সুবিচার করা। এই সুবিচারের অর্থ হওয়া উচিত—প্রত্যেক মানুষ আপন শ্রমের ফল ভোগ করিবে। কিন্তু আজ আমরা ইহার বিপরীতই দেখিতে পাইতেছি।

মানবজীবনের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক তাহাই ধন। খাদ্য বস্ত্র ও গৃহকেই প্রকৃত ধন বলা সঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে এইসকল যাহারা উৎপাদন করে তাহারাই প্রকৃত ধনোৎপাদনকারী। প্রকৃত ধনের উৎপাদক কৃষক, কারণ সে জমি হইতে গম চাউল ও কার্পাস উৎপন্ন করে। ভোর না হইতেই সে ক্ষেতে হাজির হয়। কি জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্রে কি পৌষ-মাঘ মাসের কনকনে শীতে সে হাল চালনা করে। তাহার দেহ হইতে অবিরল ধারায় ঘাম ঝরে। তাহার এক এক হাতে সাত সাতটি কড়া পড়ে। কোদাল চালাইতে গিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে পরিশ্রম করিয়া চলে। কারণ সে জানে ধরিত্রী মাতার নিকট কোনো কারসাজি চলিবে না, স্তুতি প্রার্থনায় সে তাহার হৃদয় বিগলিত করিতে পারিবে না। এই মূল্যহীন তুচ্ছ মৃত্তিকা সোনালী গম, রূপালী চাউল এবং আঙ্গুরবরণ মুক্তায় তখনই রূপান্তরিত হয় যখন ধরিত্রীমাতা দেখিতে

পান কৃষক ইহার জন্য তাহার দেহের রক্ত জল করিতেছে, ক্লান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন, তাহার হাত হইতে কোদাল অবশ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে।

ফলন্ত গম দশ-বিশ মন হিসাবে কোনো এক জায়গায় পড়িয়া থাকে না, এক একটি শিষে দশ-বিশটি করিয়া সারা ক্ষেতে ছড়াইয়া থাকে। কৃষক উহা একত্র করিয়া শিষ হইতে পৃথক করে। একত্রিত দশ-দশ বিশ-বিশ মনের স্তূপ দেখিয়া একবার তাহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। মাসের পর মাস ক্ষুধায় অর্ধ-মৃত তাহার সন্তানগণ লুব্ধদৃষ্টিতে এই শস্যরাশিকে দেখিতে থাকে। মনে করে বুঝি বা দুঃখের কালরাত্রি কাটিয়া আসিয়াছে, সুখের প্রভাত শীঘ্রই দেখা দিবে। উহারা কী করিয়া বুঝিবে তাহাদের মাতাপিতার বহু কষ্টে উৎপাদিত এই শস্য তাহাদের জন্য নহে। ভোগ করিবার অধিকার সেই সকল স্ত্রী-পুরুষের যাহাদের হাতে কোনো কড়া পড়ে নাই, যাহাদের হাত গোলাপের ন্যায় লাল এবং মাখনের মত কোমল। তাহাদের জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর খসখসের পর্দা, বৈদ্যুতিক পাখার নিচে কিংবা সিমলা, নৈনিতালে অতিবাহিত হয়। শীত তাহাদের জন্য কষ্টকর নহে, বরং মোলায়েম পশমের এবং মূল্যবান চামড়ার পোশাকে সবশরীর আচ্ছাদিত থাকায় হয় আরামদায়ক। আনন্দের সকল পথই তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। জমিদার, মহাজন, মিলমালিক, অধিক বেতনভোগী কর্মচারী, পুরোহিত এবং অন্য সকল প্রকারের অলস অপদার্থ ধনীদিগেরই কৃষকের কষ্টার্জিত উপার্জনের উপর প্রথম অধিকার।

শ্রমিক কারখানায় বাঁশি বাজিতেই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কারখানার দিকে ছোটে। অল্প কিছুদিন পূর্বেও শ্রমিকদিগের কাজের সময়ও নির্দিষ্ট ছিল না। এখনো কেবলমাত্র অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিযুক্তকারী কারখানার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযুক্ত। সেখানে সে দৈনিক তিন কি চারি আনা পারিশ্রমিকে* কাজ করে। ইহাতে তাহাকে স্ত্রী, তিন-চারটি শিশু এবং বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রতিপালন করিতে হয়। নিশ্চিন্ত মনে একটি দিনের জন্যও ভরপেট আহার তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার উপরে যদি সে অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কাজ হইতে বরখাস্ত। বৃদ্ধ বা অঙ্গহীন হইয়া পড়িলে সংসারে তাহাকে বা তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করিবারও কেহ নাই। কেবল ইহাই নহে। গতকাল

* বর্তমানে মজুরির হার বেড়েছে—অনুবাদক।

পর্যন্ত কারখানা চব্বিশ ঘণ্টা চলিতেছিল, আজ মালিকের নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে জিনিসের দাম পড়িয়া গিয়াছে, এখন চলতি দামেও বাজারে কোনো ক্রেতা নাই। কারখানায় তালা পড়িল। শ্রমিক ও তাহার সন্তানদের একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতে হয়। যখন শ্রমিক কাজ করিয়া পারিশ্রমিক পাইত তখন তাহার জীবন নরক হইতে অধিক সুখের ছিল না, কিন্তু এখন বেকার জীবন তো জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুর সমতুল্য। এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও শ্রমিক সুন্দর বস্ত্র, চিনি, মিঠাই ও অসংখ্য প্রকারের ভোগ-বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত করে। সে নিজ হস্তে বড় বড় মহল, বাংলো, বাগান, নয়নাভিরাম পথঘাট তৈয়ার করে। কিন্তু তাহার জন্য কী জোটে? তাহার কুঁড়ে ঘর বর্ষাকালে কদাচিৎই শুষ্ক থাকে, তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিতে ছিন্নবস্ত্রও জোটে না। তাহারই নিজ হস্তে প্রস্তুত কত সামগ্রী তাহার নিকট স্বপ্নের মত মনে হয়। আর শ্রমিকের অস্থিমজ্জায় প্রস্তুত এই দ্রব্যসমূহ কে ভোগ করে? তাহার রক্তে নির্মিত অট্টালিকায় কে বাস করে? সেই সকল বিরাট জমিদার, মহাজন, মিলমালিক, মোটামাহিনার কর্মচারী এবং পুরোহিত।

কৃষক ও শ্রমিক যাহাদের জন্য যৌবন নিঃশেষ করে, নিদ্রা বিসর্জন দেয়, দেহপাত করে, তাহারা নিজেদের শুধু নগ্ন ও ক্ষুধার্ত রাখিয়াই সন্তুষ্ট নহে, উপরন্তু প্রতিপদে তাহাদিগকে অপমান করাই আপন কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কৃষক ও শ্রমিক দরিদ্র কেন? কারণ স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া সে তাহার উপার্জন এই সকল শোষককে দিয়াছে। তাহাদের রক্তপুষ্ট এই সকল ভুঁড়িদার দারিদ্র্যের জন্য তাহাদিগকেই অপমান করে। ইহাদের ভাষায় দরিদ্রের জন্য পৃথক শব্দ আছে, 'আপনি'র তো প্রশ্নই ওঠে না, তাহাদের জন্য 'তুমি'ও ব্যবহার করা চলে না—তাহাদের সম্বোধন করা হয় 'তুই' বলিয়া। তাহাদের সম্পর্কে কুৎসিত গালাগালিই বড়লোকের অধিকার। যাহাদের জন্য তাহাদের এই দারিদ্র্য, তাহাদের সম্মুখে সেই দরিদ্রেরা চৌকিতে বসিতে পর্যন্ত পারে না। গ্রামের কৃষকের প্রাণ ও সম্মান জমিদারের হস্তে। জমিদার ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে নাকে খত দিতে বাধ্য করে।

এই তো গেল প্রকৃত ধনোৎপাদনকারীদের অবস্থা। আর শোষকগণের? শ্রমিক এবং কৃষকের উপার্জন তাহাদের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাহারা একথা চিন্তা

করিয়াও দেখে না যে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও লাভের টাকা কীভাবে অর্জিত হইয়াছে। এ-কথাটি তাহারা একটিবারো ভাবিয়া দেখে না যে, এই এক-একটি টাকা জমা করিতে গিয়া কৃষক তাহার সন্তানদের কতবার অভুক্ত রাখিয়াছে, কত মা নিজেকে বস্ত্রহীন রাখিয়াছে, কত রোগী ঔষধ ও পথ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ধরনের বিচারবোধ থাকিলে তাহারা কখনো দু হাজার টাকার ফোর্ডগাড়ির পরিবর্তে ত্রিশহাজার টাকার রোল্‌সরয়েস* ক্রয় করা সঙ্গত মনে করিত না। প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকার পেট্রোল পোড়াইত না বা হাকিম প্রভুদের নিমন্ত্রণে ও আনন্দ-উৎসবে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইত না।

এই সকল যথেচ্ছাচার সত্ত্বেও কাহারো চেতনার উদ্রেক হয় না। সমাজপতিরা বলেন ধনী দরিদ্র চিরকাল ধরিয়া বর্তমান। যদি সকলকেই সমান করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কেহই কাজ করিতে চাহিবে না, দুনিয়াকে চালাইতে হইলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই থাকা প্রয়োজন। সমাজের শৃঙ্খল কারাগারের শৃঙ্খল অপেক্ষাও কঠিন। এই শৃঙ্খল চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু যেখানেই সামাজিক আইনের—যে-আইন অন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—বিরুদ্ধে কিছু ঘটে তখনই সমাজ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। কূপের মধ্যে জল আছে, উপরে ঘটি ও রজ্জু রক্ষিত। একদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিভাবে আপ্লুত লোকজন রামায়ণ পড়িতেছে—'জাতপাত জিজ্ঞাসা করিও না।'

জাতি পাঁতি পুছে নহিঁ কোঈ।
হরি কো ভজৈ সো হরি কো হোঈ॥

যে হরিকে ভজনা করে সে-ই হরি।

গীতা পাঠ হইতেছে:

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ॥

পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, সকল কিছুই ভগবানের দান।

জগৎকে সীতা ও রামময় মনে করিয়া আমি যুক্তকরে প্রণাম করিতেছি:

---

* বর্তমানে এর মূল্য বহুগুণ বেশি—অনুবাদক।

২ হাজারের গাড়ী এখন ২ লাখ।
চলছে মুসকা।

সিয়া রামময় সব জগ জানী।
করহুঁ প্রণাম জোরি যুগপাণি ॥

সমস্ত পৃথিবীই ভগবানের রূপ। কোথায়ও কোনো ভেদাভেদ নাই। দেখিয়া মনে হয় চতুর্দিকে সমদর্শিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে। সেই সময়েই জ্যৈষ্ঠমাসের খর দ্বিপ্রহরে পিপাসাতুর চামার উপস্থিত। তাহার গতি কূপের দিকে, ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ তাহার জাত নির্ণয় করিয়া ফেলেন। কানাকানি চলিতে থাকে। মহাত্মা ও ভক্তিরসে গদ্‌গদ শ্রোতৃবর্গের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। নিরপরাধ লোকটিকে যেন জীবন্ত গিলিবার জন্য সকলে ছোটে। তাহার অপরাধ? কূপ হইতে জল তুলিয়া পান করা কি মহাপাপ? এই ভক্তের দল কিছু পূর্বেই যে-রাগিণীর চর্চা করিতেছিল—তাহা শেষ না হইতেই কি এরূপ করা সঙ্গত ছিল? উহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন—তাহাদের কথায় এবং কাজে, মন্তব্যে এবং কর্তব্যে এরূপ পার্থক্য কেন? ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিবেন যে সমাজই তাহাদের দ্বারা এইরূপ করাইতে চাহে।

কোনো উচ্চবর্ণের মাতাপিতার একটি শিশুকন্যা আছে। তাহাকে আট-দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিতে সমাজ বাধ্য করিয়াছে। এগার বৎসর বয়সে কন্যাটি যখন বিধবা হইল সমাজ বলিল উহার আর দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে পারে না, এখন সারাজীবন তাহাকে ব্রহ্মচর্য পালন এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য পালনের ন্যায় ইন্দ্রিয় সংযম করিতে বিশ্বামিত্র, পরাশর, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ব্যাসের ন্যায় মহা মহা মুনিঋষিগণও ব্যর্থ হন। এই বিধবা কন্যাটির পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে উৎসুক। তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতার স্ত্রীবিয়োগের এক মাস পূর্ণ না হইতেই দ্বিতীয় বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। সমাজের বুদ্ধি কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত? তাহার দৃষ্টি কি আচ্ছন্ন? তাহার কি এতটুকু জ্ঞান নাই যে এই অবোধ বালিকার নিকট আজীবন ব্রহ্মচর্য ও সংযমের আশা করা দুরাশা মাত্র। প্রতিবেশীর মধ্যে প্রতি বছর কি দু-একটি গর্ভপাত সে দেখে নাই? ইহাতেও কি সে বুঝিতে পারে না যে যদি এই বালিকাকে প্রকাশ্যে পুরুষ সংসর্গের সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে গোপনে করিবে? প্রকাশ্যে করিতে

দিলে সে সম্ভবতঃ বংশ বা জাতির কথা চিন্তা করিবে। কিন্তু গোপনে করার ফলে সে সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়ের সহিতও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এই গুপ্ত প্রণয়ের পরিণাম তাহার নিকট অজ্ঞাত নয় এবং উহা তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডতুল্য। যদি গর্ভপাতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ন্যূনতম শাস্তি ইহাই হইবে যে মাতাপিতা ভ্রাতা বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন কোনো অপরিচিত শহরের কোনো নির্জন স্থানে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেখানে আজীবন তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি কিংবা ঐ প্রকারের কোনো জীবিকা অবলম্বন করিতে হইবে। সমাজের জন্য তাহার আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষপানে বা অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিতে সক্ষম। যদি গুপ্ত প্রণয়কে গোপন করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দু-একবার গর্ভপাতও করা যাইবে। যে-সমাজ এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করে এবং ইহার পরিণামই বা কী সম্যক উপলব্ধি করে—সে-সমাজ কী করিয়া এই ভাগ্যহীনাদের জন্য এইরূপ শর্তের বিধান দেয়? ইহা হইতেই কি তাহার হৃদয়হীনতা সুস্পষ্ট হয় না! কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে এইরূপে কলুষিত পীড়িত ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া কি সে তাহার নরপিশাচ-রূপেরই পরিচয় দিতেছে না? এই সমাজের জন্য কি আমাদের হৃদয়ে কোনো শ্রদ্ধা, কোনো সহানুভূতি থাকিতে পারে? বাহিরে ধর্মের মুখোশ, সদাচারের অভিনয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের তামাশা, এদিকে ভিতরে এই জঘন্য কুৎসিত কার্যকলাপ। ধিক্ এই সমাজকে, নিপাত যাক এই সমাজ!

যে-সমাজ প্রতিভাবান ব্যক্তিগণকে জীবন্ত প্রোথিত করা আপন কর্তব্যজ্ঞান মনে করে এবং বেনাবনে মুক্তা ছড়াইয়া যাহার আনন্দ, সেই সমাজের অস্তিত্ব কি আমাদের মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা উচিত? এক দরিদ্র মাতাপিতা, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই। তাহাদের ঘরে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বালকের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে এক ধনীর সন্তানকে খেলা করাইতে হইত। গরু ভেড়া চরাইয়া নিজের অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য হইত। সন্তানকে লেখাপড়া শেখানো যে মাতাপিতার কর্তব্য—এই জ্ঞানও তাহার মাতাপিতার ছিল না। থাকিলেও তাহাদের না ছিল বেতন দিবার ক্ষমতা, না ছিল বইপত্র কিনিবার সামর্থ্য। পুত্রটি বড় হয়, বৃদ্ধ হইয়া একদিন মরিয়াও যায়। তাহার সাথে তাহার প্রতিভা—যে-প্রতিভার দ্বারা সে দেশকে চাণক্য, কালিদাস, আর্য-

ভট্ট, রবীন্দ্রনাথ, রমন দিতে পারিত—বিনষ্ট হয়।

আমি একটি গ্রামের অভিনেতাকে দেখিয়াছিলাম। যদি সে অন্য কোনো দেশে—যেখানে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আছে—জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে জগদ্বিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হইতে পারিত। কিন্তু আজ ষাট বৎসর বয়সে শিক্ষাহীন ব্যক্তির সেই অসাধারণ প্রতিভা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের জীবনের কয়েকটি জীবন্ত চিত্রণদ্বারা মাত্র নিজের পরিচিত লোকজনের সামান্য চিত্তবিনোদন করিতে পারে। আমি এরূপ স্বভাব-কবি দেখিয়াছি যাহাদের সামান্য অক্ষর জ্ঞানও নাই। যে-ভাষায় তাহারা কথা বলে—তাহাতে কোনো লিখিত সাহিত্য, কোনো গুরুপরম্পরা নাই এবং ছন্দ ও অলঙ্কারের সহিত পরিচিত হইবার কোনো উপায়ও নাই। তথাপি তাহারা নিজ নিজ ভাষায় অনেক সুললিত ও রসপূর্ণ কবিতা লেখেন। শিক্ষিতেরা তাহাদের কবিতাকে গ্রাম্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং এজন্য তাহারা নিজেরাও তাহা অনাদর করে, কবিতার জন্য বাহির হইতে না পায় কোনো প্রেরণা, না পায় কোনো উৎসাহ। কেবলমাত্র ভিতরের প্রেরণায় বাধ্য হইয়া কিছু লিখিয়া ফেলে।

আমি একটি গ্রাম্য বালকের কথা জানি। তাহার মাতা বিধবা। সামান্য জমি মাতা ও পুত্রের জীবিকার উপায়। বালকটি গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। অসাধারণ মেধাবী বালক, বিশেষ করিয়া গণিতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে ছাত্রবৃত্তি লাভ করে এবং উহার সাহায্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় এবং উহাতেও সে ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। বৃত্তি যদিও লেখাপড়া করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না তথাপি কোনোরূপে সে তাহার পড়াশুনা চালাইয়া যাইতে পারিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যুক্তপ্রদেশ হইতে উত্তীর্ণ কয়েক সহস্র ছাত্রের মধ্যে সে দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু যে দু-একটি ছাত্র তাহার অপেক্ষাও অধিক নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহারা ধনীর দুলাল। তাহাদের জন্য গৃহে দু-তিন জন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল। আমার পরিচিত তরুণ বালকটির মত তাহাদের আহার ও বাসস্থানের জন্য দুশ্চিন্তা করিতে হইত না। এবারো সে ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে। পাঠ্যবিষয় ছিল রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান। ছাত্রবৃত্তি খরচ সঙ্কুলান হইবার মত ছিল না। তাহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। তাহার উপর গ্রামের

পরিবেশ হইতে আসিয়া সে তীক্ষ্ণধী ছাত্রগণের জন্য বিখ্যাত এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হইয়াছিল। সেখানে ছাত্রবৃত্তিও কম। একটি ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি ছাত্রের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর একই ছিল। ছাত্রবৃত্তি কাহাকে দেওয়া উচিত উহা স্থির করিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ দুইটি বিষয় নির্বাচন করিল যাহাতে অপর একটি ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর বেশি হয়। এই বালকটি অবশ্যই ধনী সন্তান। কেহ ইহা বিচার করিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করিল না যে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে-বালক অসংখ্য বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া এই পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার ভবিষ্যতে কী হইবে।

এই ঘটনাটির এক বৎসর পরে আমার এই তরুণ বালকটির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। আমি দেখিলাম তাহার ক্ষয়রোগীর ন্যায় চেহারা হইয়াছে। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ছেলেটি প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার পর তাহার একটি বন্ধু বলিল যে সে এই বৎসর ছাত্রবৃত্তি লাভ করে নাই। অনেক ধরাধরি করিয়া বেতন মকুব করা হইয়াছে। খাওয়া থাকার খরচ চালাইবার জন্য সে ছাত্র-শিক্ষকতার কাজ পাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। দু-একটি বন্ধু তাহাকে নিজেদের কাছে রাখিতে চাহে কিন্তু সে ইহা আত্মঅবমাননাকর মনে করে। পরের দিন আমি যে তাহার বিষয়ে ওয়াকিবহাল জানাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'খবর ঠিকই। ছাত্র পড়াইবার কাজ যোগাড় করিতে আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কলেজে ছুটির ঘণ্টা বাজিতেই আমি কাজের সন্ধানে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু কোনো জায়গা হইতেই কিছু পাইবার লক্ষণ না দেখিয়া আমি এখন সন্ধান করা ছাড়িয়া দিয়াছি।' যখন আমাকে এই প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ যুবকের এই অনাদর দেখিতে হয় এবং এই খবরও শুনিতে হয় যে ছেলেটি মাত্র দিনান্তে একবার সামান্য কিছু খিচুড়ি খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে, তখন সত্যকথা বলিতে কি আমার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আমার এই কথাই মনে হইতেছিল যে এইরূপ সমাজকে বাঁচিতে দেওয়া পাপ। এইরূপ পাপী ধূর্ত বেইমান অত্যাচারী নৃশংস সমাজকে অগ্নিসংযোগে জ্বালাইয়া দেওয়াই উচিত।

একদিকে প্রতিভার এই অনাদর, অন্যদিকে ধনীর মূর্খ সন্তানের জন্য আধ ডজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া পরীক্ষার বৈতরণী উত্তীর্ণ করানো।

আমি এরূপ এক ব্যক্তিকে জানিযাহার মস্তিষ্কে কোনো সার পদার্থ ছিল না কিন্তু সে কোটিপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াও কঠিন ছিল। কিন্তু আজ সে শুধুই এম এ নহে—ডক্টরেটও। তাহার নামে কয়েক ডজন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বাহিরের জগৎ তাহাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য করে। একবার এক ভদ্রমহোদয় 'তাহার' একটি পুস্তক পাঠ করিয়া এই মন্তব্য করে—'আমি ইহার লেখা একটি পুস্তক পূর্বে পড়িয়াছি। তাহার ইংরাজী অতি সুন্দর ছিল, অথচ এই পুস্তকটির ভাষা অতি কদর্য।' তিনি কী করিয়া জানিবেন এই দুইটি পুস্তকের লেখক ভিন্ন। প্রতিভাকে এইরূপে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও যে-সমাজ ক্ষুব্ধ হয় না—সেই সমাজ ধ্বংস হউক!—ইহা ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে?

ধর্ম

এমনিতে তো ধর্মগুলির পরস্পরের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একটি যদি পূর্বদিকে মুখ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেয় তো অপরটি পশ্চিমদিকে। একটি যদি মাথার চুল বড় রাখিতে বলে, অপরটি বলে দাড়িকে বড় করিতে। একটি যদি গোঁফ কাটিতে নির্দেশ দেয় অপরটি গোঁফ রাখিতে। একটি যদি জবাই করিয়া পশুহত্যা করিতে বলে তো অপরটি বলে এক কোপে কাটিয়া ফেলিতে। এক যদি জামার গলা দক্ষিণদিকে রাখে তো অপরটি বামদিকে। একটি এঁটোর বিচার করে না, অপরটির একটি জাতির মধ্যেও অনেক ভাগ। একটি একমাত্র খোদাতালা ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কাহারো নাম থাকিতে দিতে রাজি নয়, অপরটিতে দেবতার সীমা সংখ্যা নাই। একটি গাভীর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে বলে তো অপরটি গো-কোরবানিকে পুণ্যকার্য বলিয়া মনে করে।

এইরূপে পৃথিবীতে সকল ধর্মের মধ্যেই গভীর মতভেদ বর্তমান। এই মতভেদ কেবল চিন্তাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, উপরন্তু বিগত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস বলে যে এই মতানৈক্যের জন্য ধর্মগুলি একে অন্যের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিয়াছে। গ্রীক ও রোমের অমর শিল্পীগণের কীর্তিগুলির কেন আজ এরূপ অভাব? এইজন্য যে ইহার পরে এমন এক ধর্ম আসে যাহা এই মূর্তিগুলিকে নিজ ধর্মের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিয়াছিল। ইরানের জাতীয় কলা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতি আজ কেন ধ্বংসপ্রায়? কারণ এরূপ একটি ধর্মের সহিত তাহাকে লড়াই করিতে হইয়াছিল যে ইরানের নাম পর্যন্ত পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছিল। মেক্সিকো ও পেরু, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তান, মিশর ও জাভা—যেখানেই দেখুন না কেন সর্বত্রই ধর্মগুলি নিজেদের কলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরম শত্রু বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। আর রক্তপাত? ইহার জন্য আর প্রশ্ন তুলিবেন না। আপন আপন খুদা এবং ভগবানের নামে, আপন আপন ধর্মগ্রন্থের এবং ভণ্ডামীর নামে মানুষের

রক্তকে ইহারা জল হইতেও সস্তা করিয়াছে। যদি প্রাচীন গ্রীকধর্মের নামে নিরপরাধ খৃস্টান বালক, বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষকে ব্যাঘ্র দ্বারা ভক্ষণ করানো, তরবারির দ্বারা হত্যা করা বড় পুণ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষমতায় আসীন খৃস্টানরাই বা কেন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? খৃস্টধর্মের নামে তাহারা প্রকাশ্যেই তরবারি চালাইয়াছিল। জার্মানিতে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার অভি-প্রায়ে প্রায় সর্বজনীন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন জার্মানগণ ওক বৃক্ষের উপাসক ছিল। এই ওক বৃক্ষগুলি পুনরায় যাহাতে তাহাদের পথভ্রষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্য একটি ওক বৃক্ষকেও রাখিতে দেওয়া হয় নাই। পোপ এবং পেট্রিয়াক, বাইবেল এবং খৃস্টের নামে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের চিন্তার স্বাধীন-তাকে লৌহ এবং অগ্নির মাধ্যমে দাবাইয়া রাখা হইয়াছিল।

সামান্য মতানৈক্যের কারণে কত লোককে চক্রের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে, কতজনকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। ভারতভূমিও এই প্রকারের ধর্মা-ন্ধতার বলি না হইয়া পারে নাই। ইসলাম ধর্ম আসিবার পূর্বেও কি ধর্মের নামে শূদ্রকে বেদমন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণের অপরাধে মুখে ও কানে গলিত দস্তা ও লাক্ষা প্রবেশ করাইয়া হত্যা করা হয় নাই? শঙ্করাচার্য — যিনি সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ইহাই প্রচার করিতেছিলেন যে ব্রহ্ম ছাড়া সকলই মিথ্যা — তথা রামানুজ ও অপর সকলের দর্শন বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র শক্তি দ্বারা শূদ্র ও পদদলিতকে নিচে দাবাইয়া রাখিতে তাঁহারা কোনো ত্রুটি রাখেন নাই। ইসলামধর্ম আসিবার পরে তো হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের রক্তাক্ত বিরোধ আজ পর্যন্ত চলিতেছে। এই বিরোধ আমাদের দেশকে নরকসদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। প্রচারের জন্য ইসলামকে শান্তি ও সৌভাত্রের ধর্ম বলা হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মকেও ব্রহ্মজ্ঞান এবং সহিষ্ণুতার ধর্ম বলিয়া দাবি করা হয়। কিন্তু এই ধর্ম দুইটি কি আপনাদের এই দাবিকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছে? হিন্দু মুসলমানকে দোষারোপ করে যে নিরপরাধকে হত্যা করিয়া তাহাদের মন্দির এবং পবিত্র তীর্থগুলিকে অপবিত্র করিয়া তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু লড়াইয়ের সময় কি হিন্দুরাও নিরপরাধকে খুন করিতে পশ্চাৎপদ? আপনি কানপুর কিংবা বেনারসের যে কোনো একটি ঝগড়া দেখুন, সর্বত্র ইহাই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দু আর মুসলমানের ছুরির শিকার হইয়াছে নিরপরাধ

স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ। গ্রাম হইতে বা অন্য পল্লির কোনো হতভাগ্য না জানিয়া ঐ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে আর কেহ পশ্চাৎ হইতে ছোরা মারিয়া পালাইয়া গিয়াছে। সকলেই দয়া ও ধর্মপরায়ণতার দাবি করে, কিন্তু ভারতবর্ষের এই ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিরোধ বিচার করিয়া দেখুন তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে সেখানে লেশমাত্র মনুষ্যত্ব নাই। নিরস্ত্র বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাই নহে, ক্ষুদ্র শিশুদিগকেও হত্যা করা হইতেছে, নিজ ধর্মের শত্রুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা আজো দেখা যায়।

একই দেশ ও একই জাতি মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধে। রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা অস্বাভাবিক কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা কী দেখিতে পাইতেছি? গোড়ায় কিছু না থাকিলেও হিন্দুগণের সকল জাতির মধ্যেই এখন একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। আপনি কি কাহারো চেহারা দেখিয়া বলিতে পারেন যে ইনি ব্রাহ্মণ আর উনি শূদ্র। কয়লার চাইতে কালো ব্রাহ্মণ আপনি লক্ষ লক্ষ দেখিতে পাইবেন। আর শূদ্রের মধ্যে গৌরবর্ণের লোকের অভাব নাই। জাতির সহস্র বন্ধন থাকিলেও পাশাপাশি যাহারা বাস করে এমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক আমরা আজকাল দেখিতে পাই। কত ধনী, উচ্চবংশ, রাজবংশ সম্বন্ধে লোকে স্পষ্টই বলে—দাসপুত্র রাজা হইয়াছে, আর দাসীপুত্র রাজপুত্র। ইহা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম মানুষকে সহস্র জাতির মধ্যে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কিছু লোক হিন্দু নাম লইয়া জাতীয় ঐক্য স্থাপন করিতে চায়। কিন্তু কোথায় এই হিন্দু-জাতীয়তা? হিন্দুজাতি তো একটি কাল্পনিক শব্দমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সেখানে আছে ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণও নহে—শক, দ্বীপবাসী, সনাঢ্য, জুঝৌতিয়া, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, ভূমিহার, কায়স্থ, চামার ইত্যাদি ইত্যাদি। এক রাজপুতের আহার-বিহার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ নিজের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাহার সামাজিক দুনিয়া আপন জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এজন্য যখন একজন রাজপুত উচ্চপদে আসীন হয় তখন চাকুরি দিতে, সুপারিশ করিতে অথবা অন্য উপায়ে সকলের প্রথমে সে নিজের জাতির লোকের সুবিধা করিতে চায়। ইহা স্বাভাবিক। জীবন-মৃত্যু সকল বিষয়েই যখন সর্বক্ষণ আপন জাতির লোকই সম্পর্ক রাখিয়া থাকে তখন কাহারো দৃষ্টি কী করিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে? এমনিতে ইসলাম হিন্দুকে খোঁটা দিবার জন্য বলে যে—

আমরা জাতিভেদের বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেই সকলে ভাই ভাই ! কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত সত্য ? যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে মোমিন (জোলা), আনসার (ধুনিয়া), রাইন (কুঞ্জড়ো) ইত্যাদির প্রশ্ন উঠিত না। অর্জল এবং আশ্‌রফ শব্দ কাহারো মুখ হইতে বাহির হইত না। সৈয়দ, শেখ, মালিক, পাঠান—এই ধরনের চিন্তা নিজেদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জন্য। হিন্দুদিগের উচ্চবর্ণের লোকরাও ঐরূপ করিয়া থাকে। আহারাদির ক্ষেত্রে ছোঁয়া-ছুয়ির প্রশ্ন কম, তবে ইহা তো অধুনা হিন্দুদের মধ্যেও কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের উচ্চবর্ণেরা কি নিম্ন-বর্ণের লোকদিগকে অগ্রসর হইবার সুযোগ কখনো দিয়াছে ? ধর্মীয় নেতা হইতে হইলে উচ্চজাতির হওয়া দরকার। রাজদরবার এবং সরকারি চাকুরি সর্বত্রই উচ্চজাতির জন্য সুরক্ষিত। নবাব, জমিদার, তালুকদার সকলেই উচ্চবর্ণসম্ভূত। ভারতীয়দের মধ্য হইতে চার পাঁচ কোটি লোক হিন্দুদের সামাজিক, আর্থিক এবং ধর্মের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইসলাম ধর্মের শরণ নেয়। কিন্তু ইসলামের উচ্চবর্ণেরা কি তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিয়াছে ? সাতশত বৎসর পরেও আজ গ্রামের মোমিন জমিদার আর উচ্চবর্ণের মুসলমানের জুলুমবাজির নিকট ততখানিই শিকার যতখানি কাহ্নু, কুর্মী, তাহার প্রতিবেশী হিন্দুগণ। হিন্দু-দের সহিত লড়াই ও ইংরাজের খোসামোদ করিয়া কাউন্সিলে স্থান ও সরকারি চক্যারিতে আপন স্থান সুরক্ষিত করা হইতেছে। কিন্তু সেই সংখ্যাকে যখন নিজে-দের মধ্যে বিতরণের প্রশ্ন আসে তখন উহাদের মধ্যেপ্রায় সব কয়টি উচ্চবর্ণের সৈয়দ এবং শেখ নিজেদের জন্যই রাখে। শতকরা ষাট কি সত্তর জন হইয়াও মোমিন এবং আনসার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। অজুহাত দেখানো হয় যে উহাদের মধ্যে শিক্ষা নাই। কিন্তু শত শত বৎসর পরেও যদি তাহারা শিক্ষায় এরূপ পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে তো তাহার জন্য অপরাধ কাহার ? উহাদের কবে শিক্ষিত হইবার সুযোগ দান করা হইয়াছে ? লেখাপড়া শিখাইবার বা ছাত্রবৃত্তি দিবার সুযোগ ঘটিলে সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকে আত্মীয়স্বজনের দিকে। মোমিন এবং আনসার, বাবুর্চী এবং চাপরাশি, খিদমদ্‌গার এবং হুক্কাবরদার কাজ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে যদি কেহ শিক্ষালাভও করে তাহা হইলে তাহার সুপারিশ করিতে তাহাদের জাতির মধ্যে কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও

নাই। আর বাহিরের লোক তাহার নিজের আত্মীয়স্বজনকে ছাড়িয়া তাহার জন্য কেন সুবিধা করিয়া দিতে যাইবে? চাকুরি এবং উচ্চপদের জন্য এত দৌড়াদৌড়ি এত চেষ্টা কেবলমাত্র জাতি ও দেশসেবার জন্য নহে। ইহা অর্থের জন্য, সম্মান এবং আরামে জীবন যাপন করিবার জন্য।

হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক ধর্মাবলম্বী হইবার দরুন কি তাহাদের জাতি পৃথক হইতে পারে? যাহাদের শিরায় একই পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, যাহারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই পালিত হইয়াছে, দাড়ি এবং টিকি, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে উপাসনা কি তাহাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে? জল হইতে কি রক্ত গাঢ় নয়? হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে রচিত এই পৃথক জাতিতত্ত্বকে ভারতবর্ষের বাহিরে কে স্বীকার করিবে? জাপানে অথবা জার্মানিতে যান, ইরানে অথবা তুরস্কে যান— সর্বত্রই আমাদিগকে হিন্দী (ভারতীয়) অথবা ইণ্ডিয়ান বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে-ধর্ম ভাইকে পর করিয়া দিতে চাহে, তাহাকে ধিক্কার! যে-ধর্ম ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করে ধিক্ সেই ধর্মকে! যখন কোনো লোক টিকি কাটিয়া দাড়ি রাখিলেই মুসলমান এবং দাড়ি মুড়াইয়া টিকি রাখিলেই হিন্দু বলিয়া গণিত হয়— তখন ইহার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। এই পার্থক্য নিতান্তই বাহ্যিক এবং কৃত্রিম। একজন চৈনিক বৌদ্ধ হউক অথবা মুসলমান, খৃস্টান হউক অথবা কনফিউসিয়াস-পন্থী, উহার জাতি চৈনিকই থাকে। একজন জাপানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হউক অথবা শিন্তো—তাহার জাতি জাপানী। একজন ইরানি মুসলমান হউক অথবা জরথুস্ত্র—কিন্তু সে নিজের ইরানি নাম ত্যাগ করিয়া অন্য কোনো নাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা কী কারণে জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে উদ্যত হই এবং কী কারণেই বা আমরা এই অনুচিত কার্য-কলাপ স্বীকার করিয়া লই?

ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। ইহার ফলে আজকাল ধর্মগুলির মধ্যে মিলনসাধনের কথাবার্তাও কখনো কখনো শোনা যাইতেছে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? 'ধর্ম নিজেদের মধ্যে বৈরী শিক্ষা দেয় না' (মেজহব নহী সিখাতা আপস মে বৈর রখনা) এই নির্জলা মিথ্যার কি কোনো সীমা আছে? যদি ধর্মই শত্রুতা না শিখাইবে তাহা হইলে আজ পর্যন্ত টিকি এবং দাড়ির লড়াইয়ে

আমাদের দেশ উত্যক্ত কেন? প্রাচীন ইতিহাসের কথা না হয় ছাড়িয়া দিন, আজো কি ভারতবর্ষের শহরে এবং গ্রামে এক ধর্মাবলম্বীকে অপর ধর্মাবলম্বীর রক্তপান করিবার জন্য উন্মত্ত করা হইতেছে না? কে গো-ভক্ষণকারীদের সহিত গোময়-ভক্ষণকারীদের বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে? প্রকৃত কথা এই যে ধর্মই নিজেদের মধ্যে লড়াই করিতে শিখায়। ভাইকে ভাইয়ের রক্তপান করিতে প্ররোচনা দেয়। ভারতবাসীদের ঐক্য ধর্মের মিলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে ধর্মের ভস্মাবশেষের উপর। কাককে ধুইয়া রাজহংস করা সম্ভব নয়। ধর্মের রোগ খুবই স্বাভাবিক। তবে মৃত্যু ব্যতীত উহার অন্য কোনো চিকিৎসা নাই।

একদিকে এই ধর্মগুলি একে অপরের রক্তপিপাসু। উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একে অন্যের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার, কথা-বার্তা, রীতি রেওয়াজে একে অপরের বিপরীত পথ অনুসরণ করে। কিন্তু যেখানেই দরিদ্রকে শোষণ এবং ধনীর স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন উঠে—তখন দুইয়েরই এক বুলি। গর্দভ গ্রামের মহারাজা বেকুফবক্‌শ সিং সাতপুরুষ হইতে প্রথম শ্রেণীর মূর্খ। এখন তাহার নিকট বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি। এই জমিদারি লাভ করিতে তাহার একবিন্দু বুদ্ধিও খরচ হয় নাই। দুদিন জমিদারি চালাইবার মত বুদ্ধি ও যোগ্যতা তাহার নাই। আপন পরিশ্রমে এক ছটাক চাল বা এক চাকা গুড় উৎপাদন করিবার শক্তিও তাহার নাই। মহারাজা বেকুফবক্‌শ সিং-কে যদি চাল, গম এবং জ্বালানী কাঠ দিয়া একাকী কোনো জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তো নিজের জীবিকা অর্জন করিবার মত বুদ্ধি বা কাজ করিবার কোনো শিক্ষা তাহার জানা নাই। তিনি নিশ্চয়ই সাতদিনের মধ্যে বিলাপ করিতে করিতে ওখানেই মারা যাইবেন। কিন্তু আজ গর্দভ গ্রামের মহারাজা মাসিক দশহাজার টাকা মোটরের তেলের জন্যই উড়াইতেছেন। তাহার নিকটে কুড়িহাজার টাকার এক জোড়া কুকুর আছে। দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের জন্য এক প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পৃথক চিকিৎসক এবং ভৃত্য আছে। গ্রীষ্মকালে কুকুরের ঘরে বরফের চাকা এবং বৈদ্যুতিক পাখা লাগানো হয়। মহারাজের ভোজনের কথা আর কি বলিব? তাহার দাসানুদাসও পরম সুখে থাকে।

যে-অর্থ এইরূপ জলের ন্যায় ব্যয় করা হইতেছে তাহা আসে কোথা হইতে? যাহারা উহা উৎপাদন করিতেছে তাহাদের জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়? তাহাদিগকে ক্ষুধায় হা অন্ন হা অন্ন করিতে হয়। তাহাদের সন্তানদিগের জন্য মহারাজ বেকুফবক্‌শের কুকুরের উচ্ছিষ্টও জুটিয়া গেলে তাহারা আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিবে।

কিন্তু যদি কোনো ধার্মিককে জিজ্ঞাসা করা হয় এই ধরনের মূর্খের বিনা-পরিশ্রমে লব্ধ, অন্যের কষ্টার্জিত অর্থকে পাগলের ন্যায় নষ্ট করিবার কি অধিকার আছে? তাহা হইলে পণ্ডিতপ্রবর উত্তর দিবেন—ইনি তো পূর্বজন্মের সঞ্চয় ভোগ করিতেছেন, ভগবান তাঁহাকে বড় করিয়াই জন্ম দিয়াছেন। বেদশাস্ত্র বলে উচ্চ-নীচ সৃজনকর্তা ঈশ্বর। দরিদ্র যে আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে ইহা ভগবানপ্রদত্ত শাস্তি। যদি কোনো মৌলবী বা পাদরিকে জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে উত্তর পাইবেন—'তুমি কি কাফের, তুমি কি নাস্তিক? দুনিয়ার কার্যকলাপ চালাইবার জন্য ঈশ্বর ধনী-দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরের বিধানে মানুষের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই।'

প্রশ্নকরা হয়—যদি বিনা পরিশ্রমে মহারাজ বেকুফ সিং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ উপভোগ করে, তাহা হইলে এই মগের মুলুকের রাজার নিকট কুর্নিশ করিলে কিছু হইবার আশা কোথায়?

উল্লুক শহরের নবাব নামাকুল খাঁ বহু প্রাচীন ধনী। তাহারো বিরাট জমিদারি আছে এবং আরামবিরামের ব্যবস্থা বেকুফবক্‌শ সিং-এর অপেক্ষা কম নহে। তাহার শৌচাগারের দেওয়ালে আতর মাখানো হইয়া থাকে আর গোলাপজলে ধোয়া হয়। সুন্দরী এবং স্বর্গের পরীদের ফাঁদে ফেলিবার জন্য তাহার অসংখ্য অনুচর দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই রূপসীরা একবার স্পর্শেই বাসী হইয়া যায়। পঞ্চাশ হাকিম, চিকিৎসক এবং কবিরাজ তাহার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে থাকে। দুইশত বছরের পুরাতন মদ প্যারিস এবং লণ্ডন হইতে অত্যন্ত বেশি দামে ক্রয় করিয়া রাখা হইয়াছে। ইন্দ্রের পরীদের জিহ্বা অপেক্ষাও নবাববাহাদুরের পদতল কোমল এবং গোলাপী। তাহার পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কত স্বামীকে প্রাণ হারাইতে হয়, কত পিতাকে মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়াইয়া কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বৎসরে যাট লক্ষ টাকার

আয়ও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে প্রতি বৎসর পাঁচ-দশ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়া যায়। সরকারের তরফ হইতে তাহাকে বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বড়লাটের দরবারে সর্বপ্রথমে তাহার আসন। বড়লাটকে স্বাগত জানাইতে ও অভিনন্দনপত্র পড়িবার কাজ সর্বদা উল্লুক শহরের নবাববাহাদুর এবং গর্দভ গ্রামের মহারাজাকে দেওয়া হইয়া থাকে। বড়লাট এবং ছোটলাট উভয়েই শ্রেষ্ঠ অভিজাতবংশীয় এই দুইজনের বুদ্ধি কর্মযোগ্যতা এবং প্রজাবৎসলতার প্রশংসা করিয়া কূল পান না। পণ্ডিত, মৌলবী, পুরোহিত এবং পাদরি সকলেই এই বিষয়ে একমত যে নবাববাহাদুরের সম্পদ ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং কর্মফল। দিন-রাত্রি নিজেদের ও অনুগামীদের মধ্যে দাঙ্গা ইত্যাদি বজায় রাখিতে আল্লাহ্ এবং ভগবান সম্পূর্ণ একমত। বেদ, কোরান এবং বাইবেল এই বিষয়ে একই শিক্ষা দেয়। এই রক্তশোষণকারী শোষকদিগের স্বার্থরক্ষাই যেন ধর্মগুলির কর্তব্য। মৃত্যুর পরেও বেহেস্ত্ এবং স্বর্গের সর্বাপেক্ষা সুন্দর প্রাসাদ, মনোরম উদ্যান, আয়তলোচনা অপ্সরা, সর্বোৎকৃষ্ট সুরা এবং মধুর স্রোত উল্লুক শহরের নবাব এবং গর্দভ গ্রামের মহারাজা এবং তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত। কারণ তাহারা দু-একটি মসজিদ, দু-চারটি শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং কিছু সাধু ও ফকির, পাণ্ডা ও মুজাবর প্রতিদিন তাহাদের হালুয়াপুরী, কাবাব পোলাও ধ্বংস করিতেছে।

গরীবের দারিদ্র্যময় জীবনের কোনো প্রতিদান নাই। তবে যদি সে প্রতি একাদশীতে উপবাস, প্রতি রমজানে রোজা এবং সমস্ত তীর্থব্রত, হজ এবং জিয়ারত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে থাকে, নিজে অভুক্ত থাকিয়া যদি ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদের ভূরিভোজন করায় তাহাদেরও স্বর্গ ও বেহেস্তের এক কোণে ঠাঁই এবং অবশিষ্ট হুরি অপ্সরা মিলিতে পারে। দরিদ্রকে শুধু এই স্বর্গের আশা লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। কিন্তু যে-স্বর্গ ও বেহেস্তের আশায় সারাজীবন দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়, সেই স্বর্গের অস্তিত্ব বিংশশতাব্দীর এই ভূগোলে কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথমে পৃথিবী চ্যাপটা বলিয়া ধারণা ছিল। স্বর্গ তাহার উত্তরে সাতপাহাড় এবং সাতসমুদ্রের ওপারে ছিল। এখন তো সেই পৃথিবীর বা সাত পাহাড় এবং সাত সমুদ্রের কোনো ঠিকানাই নাই। যে-সুমেরু পর্বতের উপর ইন্দ্রের অমরাবতী এবং ক্ষীরসাগরে অনন্তনাগের উপর

শায়িত ভগবান ছিলেন তাহা এখন বালকদিগকে ভুলাইবার কাহিনী মাত্র। খৃস্টান এবং মুসলমানদের বেহেস্তের জন্যও সেকালের ভূগোলে স্থান ছিল। আধুনিক ভূগোল তাহা খতম করিয়া দিয়াছে। তথাপি সেই স্বর্গের আশায় লোককে অভুক্ত রাখা কি ধাপ্পাবাজি নহে?

ঈশ্বর

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ঈশ্বরের ধারণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ভূত প্রেত এবং অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সন্তান পিতামাতা ও চতুর্দিকের সামাজিক পরিবেশ হইতে লাভ করে। পৃথিবীতে ধর্মগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনুগামীর সংখ্যা আজো সর্বাধিক, কিন্তু তাহাদের মনে সৃষ্টিকর্তা লইয়া কোনো প্রশ্ন নাই। রাশিয়ায় শতকরা নব্বই জন নরনারী ঈশ্বরের ফাঁদ হইতে মুক্ত। অল্পসংখ্যক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বাদ দিলে ঈশ্বরের ধারণা কাহাকেও চিন্তাগ্রস্ত করে না। ইহা নিশ্চিত যে আজিকার এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে ওখানে কেহ ঈশ্বরের নাম লইবে না। ভারতবর্ষে প্রার্থনা যাগযজ্ঞ এবং হরিসংকীর্তন দেখিয়া কিছু লোক মনে করে যে ঈশ্বর-চিন্তা আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের ধারণা নাই যে যাহাদের মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল, তাহাদের মধ্যেও উহার ব্যাপকতা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

যে-সমস্যা, যে-প্রশ্ন, যে-প্রাকৃতিক রহস্যভেদ করিতে মানুষ অপারগ হইত তাহার জন্য সে ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া লইত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ধারণা অজ্ঞানতা হইতেই উদ্ভূত। আদিম মানুষ যখন ঘর তৈয়ার করিয়া বাস করিত না, আত্মরক্ষার জন্য তখন তাহার কাছে কুড়াইয়া পাওয়া প্রস্তরখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না। ঐ সময় সমস্ত জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং ঐ সকল জঙ্গলে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তি নেকড়ে ইত্যাদি বড় বড় হিংস্র জন্তু ঘুরিয়া বেড়াইত। আদিম মানুষ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, গুহায় লুকাইয়া সর্বদা সজাগ থাকিয়া কোনোপ্রকারে নিজের জীবন রক্ষা করিত। অন্ধকারে শিকারের উদ্দেশ্যে জন্তুরা ওত পাতিয়া বসিয়া থাকিত। এই জন্তুদের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত থাকিত। এইরূপে সেই অন্ধকার আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত মানুষের ভয়ের কারণ হইয়া আছে। পরবর্তীকালে যখন মানুষ তাহার ভাষার উন্নতি সাধন করে, তাহার চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার মত শব্দসম্ভার গঠিত হয় এবং প্রত্যেকে যখন আপন আপন অভিজ্ঞতার তিক্তস্মৃতিকে অপরের কাছে পৌছাইয়া দিতে থাকে, তখন বাস্তব ভয় অপেক্ষা কাল্প-

নিক ভয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। সারাজীবন সে কঠিন শাসক এবং নেতার ভয়ে ভীত ছিল। কারণ তাহারা আশ্রিতকে কিছু বলিয়া কাজ করানো অপেক্ষা পদাঘাতেই অধিক কাজ করাইত। এই ধরনের অত্যাচারে কত লোক চক্ষুহীন, খঞ্জ হইয়াছে, কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। এইরূপ নির্দয় প্রভু এবং প্রধানের ভয় তাহার মৃত্যুর পরেও লোকের মন হইতে মুছিয়া যাইত না। মৃত্যুর পরও তাহারা তাহাকে তাহাদের বাসস্থানের কোনো বৃক্ষ অথবা কোনো চত্বরের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিত। অন্ধকার হইয়া গেলে কোনো সময়ে তাহার বাহির হইবার আশঙ্কা ছিল। অজ্ঞাত ভয়ই এইরূপে দেবতার রূপ ধারণ করে। আর এই কল্পনাই পরে মহান দেবতা (মহাদেব) অথবা ঈশ্বররূপে পরিবর্তিত হয়।

আদিম মানুষের মানসিক বিকাশ তখন পর্যন্ত নিম্নস্তরে ছিল। তাহার আশঙ্কাগুলি অগভীর এবং তাহার সমাধানও অত্যন্ত সহজ ছিল। বর্ষা কেন হয়? পর্জন্য দেবতার নেতৃত্বে মেঘগুলি কোনো জলাশয় অথবা পর্বতে চরিতে যাইত। সেখান হইতে জল লইয়া তাহারা পর্জন্যের আজ্ঞানুসারে স্থানে স্থানে বর্ষণ করিত। ইন্দ্র পর্জন্যের প্রভু। সে কখনো কখনো বজ্রের সাহায্যে আপনার ক্রোধ প্রকাশ করিত। ইহাই অশনি বা বিদ্যুৎ। পর্বতের আকৃতির সহিত মেঘের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঐ সময় লোকেরা মনে করিত এগুলি পর্বতই, আকাশে মেঘের আকারে উড়িতেছে। তাহাদের ধারণা ছিল পর্বতের পাখা ছিল, ইন্দ্র কোনো এক সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রের দ্বারা পর্বতের পাখা কাটিয়া দিয়াছেন। প্রাতঃকালে পূর্ব দিকে উষার আভা দেখা দিবার সাথে সাথেই লাল রঙ কেন ছাইয়া ফেলে? স্বর্গের দেবী উষার প্রতাপে। সেসময় সূর্যকে তাহার তীব্র রশ্মির জন্য প্রচণ্ড দেবতা বলিয়া মনে করা হইত এবং সে সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া ত্রিভুবন ভ্রমণে বাহির হইত। অগ্নির নিকটে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুরাও যাইতে পারিত না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং বিশাল জঙ্গলকে সে অনায়াসে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিত। এইজন্য অগ্নি প্রত্যক্ষ মহান (ব্রহ্ম), তাহাকে উহারা প্রত্যক্ষ মহান দেবতা বলিয়া অভিহিত করিত। নদী সমুদ্র সকলেই মানুষের নিকট দেবতা ছিল, কারণ সে তাহাদের মধ্যে মানুষের ক্ষমতার বাহিরে (দিব্য) অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিত এবং বিনষ্ট করিবার ক্ষমতাও প্রত্যক্ষ করিত। ইহাদের মধ্যে মানুষ এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পাইত যাহার জটিলতাকে সে একমাত্র দেবতার কল্পনা

দ্বারাই সমাধান করিতে পারিত। এইরূপে মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আমরা এখন জানি মেঘ কী করিয়া হয়, কী করিয়া বর্ষণ হয়, কোথা হইতে কোথায় যায়, কোন কোন দেশ তাহার পথে পড়ে এবং কতদূর পর্যন্ত যায়। বজ্রের মধ্যে বিদ্যুৎ কী করিয়া সৃষ্টি হয়? বজ্র কী? সূর্য এখন আমাদের কাছে সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া চলে না। তাহার চেহারা আর সুগোল মুখ, দুই চোখ এবং কালো গোঁফবিশিষ্ট নহে। তাহার যাত্রাও এখন সেই পূর্বেকার যাত্রা নহে। উষা দেবীও সূর্যকিরণের আভা ব্যতীত কিছুই নহেন। আদিম মানুষের কাছে সূর্য আকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী দেবতা ছিল। এখন আমরা জানি আকাশে দীপ্যমান আলোক বিন্দুগুলিকে যত ক্ষুদ্র দেখায় তাহারা তত ক্ষুদ্র নহে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আমাদের সূর্য হইতেও লক্ষ গুণে বড় এবং অধিক তেজস্বী। আকাশকে অনন্ত আখ্যা দিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাহার প্রসারতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এই ধারণা অনন্ত বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বরং অজ্ঞানতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। এখনো পর্যন্ত যে-তারাকে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে মনে হয় উহা এত দূরে যে উহার আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতেই আড়াই বৎসর লাগে। ধ্রুবতারা আমাদের খুব দূরে নহে, তথাপি আজ তাহার যে-রূপকে আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা আজ হইতে পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার। দশহাজার কি কুড়িহাজার বৎসরে যাহার কিরণ আমাদের নিকট পৌঁছে তাহাদের সংখ্যাও অনেক। ইহাতে আমাদের অবাক হইবার কোনো কারণ নাই। নক্ষত্রমণ্ডলে এমন তারাও আছে যাহাদের দূরত্ব আলোকবর্ষ হিসাবে গণনা করাও কঠিন। তারা, খগোল এবং প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাকে মানুষ দেবতা এবং ঈশ্বরের আড়ালে লুকাইত।

ভূমিকম্প কেন হয়? শেষনাগ পৃথিবীর ভার আপন স্কন্ধে রাখিয়াছে। ক্লান্ত হইয়া যখন তিনি এক স্কন্ধ হইতে সরাইয়া অন্য স্কন্ধে রাখেন তখনই ভূমিকম্প হয়। আজকাল কে এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইবে? কে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকে রাহুর গ্রাস বলিয়া স্বীকার করিবে? কিন্তু কোনো এক সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট ইহা ধ্রুবসত্য ছিল। বিজ্ঞান নানাদিকে আমাদের এই অজ্ঞানতার

সীমাকে সংকুচিত করিয়াছে এবং যেখানেই আমাদের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানেই ঈশ্বর এবং দেবতার নামে উত্তর অচল হইয়া গিয়াছে। এখনো অজ্ঞানতার ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু আধুনিক মনীষীগণ উহাকে স্পষ্টই অজ্ঞানতারূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত, ঈশ্বর অথবা দেবতার ব্যাখ্যা দিয়া নহে।

ধর্ম, ভাষা এবং লোককাহিনীর তুলনামূলক অধ্যয়ন হইতে বোঝা যায় যে সৃষ্টিকর্তা এক—ঈশ্বরের ধারণা অনেক পরে আসিয়াছে। পৃথিবীর উন্নত জাতিরা—গ্রীক রোমান হিন্দু চৈনিক মিশরীয় ইত্যাদি আপন সমৃদ্ধির মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। এবং উহাদের মধ্যে যদি কেহ এই চিন্তাধারাকে স্বীকার করিয়াও থাকে তাহা হইলে তাহা সিরিয় দেশীয় ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় ব্যক্তিগত ঈশ্বরের রূপে নহে, বিশ্বজনীন ঈশ্বরের রূপে।

অজ্ঞানতার অপর নামই ঈশ্বর। আমরা নিজেদের অজ্ঞানতাকে সোজাসুজি স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করি, অতএব উহার জন্য 'ঈশ্বর' এই সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের অপর কারণ মানুষের অসামর্থ্য এবং অসহায়তা। আধুনিককালে নানাধরনের বিপদ, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার অসহনীয় যন্ত্রণায় মানুষ যখন বাঁচিবার আর কোনো পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন ইহাই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করে যে ঈশ্বরের ইহাই অভিপ্রেত। তিনি যাহা কিছু করেন সকলই মঙ্গলের জন্য, তিনি আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন। ভবিষ্যতের সুখকে মধুরতর করিবার জন্য তাঁহার এই ব্যবস্থা। অজ্ঞানতা এবং অসামর্থ্যর অতিরিক্ত যদি অন্য কোনো ভিত্তির উপর ঈশ্বর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ধনী ও ধূর্তদিগের স্বার্থরক্ষার প্রয়াসে। সমাজের সহস্র অত্যাচার এবং অন্যায় ন্যায়সঙ্গত - ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া তাহারা ঈশ্বরের দোহাই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। ধর্মের জালিয়াতিকে চালু রাখিতে এবং উহাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করিবার পক্ষে ঈশ্বরের ধারণা বড়ই সহায়ক। ধর্মের প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই কিছু বলিয়াছি, পুনরাবৃত্তির তাই আর প্রয়োজন দেখি না।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এক ক্ষুদ্র শিশুর সরল বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক কিছু নহে। পার্থক্য ইহাই যে ছোট শিশুর শব্দভাণ্ডার, দৃষ্টান্ত ও তর্কনৈপুণ্য সীমাবদ্ধ এবং বয়স্কদের কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ। এই দুইয়ের মধ্যে আমরা কেবল এই বৈশিষ্ট্যটুকুরই

পার্থক্য দেখিতে পাই। একবার তিনটি শিশু আমার সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিয়াছিল। তাহাদের বয়স সাত হইতে দশের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'ঈশ্বর কোথায় থাকেন?' উত্তর আসিল—'আকাশে।' পৃথিবী বলিলে প্রত্যক্ষ দেখাইবার প্রয়োজন হইত, কারণ পৃথিবী প্রত্যক্ষ সীমার অন্তর্গত। আকাশ আমাদের অজ্ঞানতার রাজ্যে, তাই সেখানেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুরক্ষিত। ঈশ্বরের চেহারা সম্পর্কে সকলেই একমত ছিল না। কেহ তাহাকে আপন চেহারার সদৃশ বলিয়া মনে করিত, কেহ বা বিচিত্র দেহধারীরূপে। 'ঈশ্বর কী করেন?' ইহাই সর্বপ্রধান প্রশ্ন ছিল। বালকগুলিরও মনে এই প্রশ্ন। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না—তাহার অস্তিত্ব তাহার কর্মের দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। বালকেরা বলিল—'তিনি আমাদের অন্নদান করেন।' 'আর তোমাদের পিতা?'—'পিতাকেও ঈশ্বর দেন।'

'যেদিন তোমার পিতা ওকালতি করিতে আদালতে যান না সেদিন কেন তাহার পকেটে টাকা আসে না?' বালকগুলির সমাজের জটিল সংগঠন সম্বন্ধে সেরূপ জ্ঞান ছিল না এবং জুয়া খেলার মত প্রকৃত ন্যায় না করিয়া একশতজনকে হারাইয়া দুইজনকে জিতাইয়া দেওয়া হয়—তাহাদের এই ধারণাও ছিল না। এই কারণে তাহারা ঐ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই। তাহারা এই পর্যন্ত জানিত যে আহার গৃহ খেলাধুলায় ব্যয়ের প্রশ্ন তাহাদের মাতাপিতা এবং অভিভাবকেরাই সমাধান করেন। সেখানে ঈশ্বরের সাহায্য সম্বন্ধে ইহাদের সন্দিহান মনে হয়। কিন্তু যখন উহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল—'তোমাকে মাথাধরা কে দিয়াছে—মাতাপিতা না আত্মীয়স্বজন?' উহারা বিহ্বল হইয়া পড়িল। মাতাপিতা কেন এরূপ চাহিবেন? এখানে যে ঈশ্বরের হস্ত কাজ করিতেছে তাহা সহজেই স্বীকার করানো গেল।

'আর পেটের ব্যথা?'—'ঈশ্বর দেন।' 'তোমার প্রতিবেশীকে যক্ষ্মারোগে তিলে তিলে কে মারিল?'—'ঈশ্বর'। 'সাতদিনের শিশুর মাতাকে মারিয়া কে তাহাকে অনাথ করিল?'—'ঈশ্বর।'

'মায়ের একমাত্র পুত্রকে মারিয়া তাহাকে এরূপ বিলাপ করিতে কে বাধ্য করে—যে-বিলাপ শুনিয়া পশুপাখি, এমন কি পাথরের হৃদয়ও পর্যন্ত গলিয়া যায়? কে মায়ের একমাত্র পুত্রকে মারিয়া তাহাকে সেরূপ বিলাপ করিতে বাধ্য করে?'

—'ঈশ্বর।'

''চৈত্র-বৈশাখ মাসে এক একটি আমের উপর কোটি কোটি পোকাকে কেবল রৌদ্র এবং বাতাসে মৃত্যুবরণ করিবার জন্য কে সৃষ্টি করে ? বর্ষার দিন জমির উপর অসংখ্য মশা-পোকামাকড়কে ছটফট করিয়া মরিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কে অসীম করুণার পরিচয় দেয় ?' – 'ঈশ্বর।'

'তাহা হইলে তো ঈশ্বরের একেবারেই দয়া নাই। কঠিনহৃদয় মানবের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তাহাও নাই। ক্রন্দনরত শিশুকে দেখিয়া পাথরের হৃদয় বিগলিত হয়। তুমিও সেদিন অবোধ শিশুটির মৃত্যুর পর তাহার মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া দুঃখবোধ কর নাই ?' – 'আমিও কাঁদিয়াছিলাম। কী সুন্দর শিশু! তাহার সুডৌল দেহ, বড় বড় চোখ, দন্তহীন মুখে হাসিবার সময় যে-টোল পড়িত তাহা এখনো মনে পড়ে।'

'এমন শিশুকে কে হত্যা করিয়াছে – মানুষ না রাক্ষস ?' – 'রাক্ষস হইতেও খারাপ কেহ।'

হ্যাঁ, ইহা সত্য যে পৃথিবীতে জীবদিগের সুখের দিন অপেক্ষা দুঃখের দিন দীর্ঘতর। এক মশার কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা তো শঙ্খ, মহাশঙ্খ হইতেও বেশি হইবে। আর পৃথিবীতে এই ধরনের জীবের সংখ্যা তো অর্বুদ হইবে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিবার মত পোকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রের অতিকায় মাছ পর্যন্ত অগণিত জীবন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সংখ্যা বহু অর্বুদ হইবে। বলা হইয়া থাকে যে মানুষ যদি এই জন্মে নীচ কাজ করে তবে সে শাস্তিস্বরূপ পরলোকে বা পরজন্মে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু এই যুক্তি টেকে না। কারণ পৃথিবীতে মানুষের সম্পূর্ণ সংখ্যা প্রায় দেড়শত কোটি। মানুষের অতীত কর্মভোগের জন্য কেন এত অধিক সংখ্যায় এই সকল প্রাণীর জন্ম হইবে ? ঈশ্বর এই অসংখ্য প্রাণীকে কেবলমাত্র কষ্ট ও যন্ত্রণা দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি আপনার করুণার পরিচয় দিয়াছেন ? ইহাতে তো ন্যায়বিচারের স্পর্শমাত্র নাই। বরং এই কাজ হইতে মনে হয় যে ঈশ্বর অপেক্ষা অত্যাচারী ও পাষাণহৃদয় আর কাহাকেও এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্যাঘ্র হরিণ শিকার করে, পেটের জন্য টিকটিকি ফড়িং মারে। সকল জীবই আত্মরক্ষা ও জীবন-

ধারণের জন্য অন্য জীবকে হত্যা করে। তাহারা সাধ্যমত কষ্ট দিয়া মারা পছন্দ করে না। কিন্তু ভগবান যাহাদিগকে মারেন তাহাদের মাংস দ্বারা কি তিনি ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, না আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরূপ করা আবশ্যক মনে করেন ? এই দুইটি প্রয়োজন না থাকিলে কেবলমাত্র খেলা করিবার আনন্দে এরূপ ঘোর পাপকর্মে লিপ্ত ভগবান সম্বন্ধে আমাদের কী ধারণা জন্মিবে ?

সদাচার

এক। ব্যভিচার

সৎ আচারের অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের আচার। শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলে? শ্রেষ্ঠর মধ্যে কি সকল দরিদ্রকে গণ্য করা যায়, যাহারা নিজেদের সততায় অর্জিত জীবিকায় অধিকার হারাইয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহুতাশ করে? না, শ্রেষ্ঠর অর্থ হইতেছে প্রাচীন ও নবীন রাজা, রাজর্ষি, বড় বড় নৃপতিদের পুরোহিত, গুরু, ঋষি ও মুনিগণ—যাহারা সদাচার প্রতিপন্ন করিয়া শাস্ত্র ও স্মৃতি রচনা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠর অর্থ পীর পয়গম্বর, মোসেস, দাউদ—যাহারা নিজেরাই রাজা বা শাসক ছিলেন অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সকল 'শ্রেষ্ঠ' পুরুষগণের চালচলন হইতেই তো দুনিয়ায় সদাচার গঠিত হইয়াছে। তাহাদের সদাচার আবার এক ধরনের নয়। কোথায়ও কৃষ্ণ এবং দশরথের ন্যায় সদাচারীর ষোল হাজার স্ত্রী। সুলেমান দাউদ এবং সিরিয় দেশীয় পয়গম্বরও এই ব্যাপারে বিশেষ 'উদার' ছিলেন। এখনো আমাদের দেশে ওয়াজেদ আলি শাহের সংখ্যা কম নহে। সম্প্রতি এক মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে, তিনিও এই বিষয়ে আরেকটি ওয়াজেদ আলি শাহ্। যদি একথাই সত্য হয় যে ধনীদেরই সদাচারের আদর্শ বলিয়া মানিতে হইবে তাহা হইলে তো এরূপ সদাচার না থাকাই মঙ্গল। পুরুষ একটি স্ত্রী বর্তমানে দুইবার চারবার কিংবা ইহার অধিকবার বিবাহ করিতে পারে, তথাপি হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম অনুসারে তাহার সদাচারী বলিয়া গণ্য না হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। কিন্তু ধর্মগুলির এই স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী যদি কোনো স্ত্রী একই সঙ্গে দুইটি পতি গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা দুরাচার বলিয়া মনে করা হইবে।

অবশ্য পৃথিবীতে এরূপ দেশও আছে যেখানে একটি স্ত্রীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ অনুচিত মনে করা হয় না। তিব্বতে ইহা সাধারণ রেওয়াজ। সেখানে এরূপ স্ত্রী বিরল যাহার একাধিক স্বামী নাই। এই দৃষ্টান্ত তো আমাদের

প্রাচীন ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে। পঞ্চপতি থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী ভারতবর্ষের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে একজন। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে সদাচারের প্রশ্ন কী করিয়া উঠে? অনেক দেশ আছে যেখানে প্রাচীনকাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহুপতি-বিবাহ ও বহুপত্নী-বিবাহ বিধিসঙ্গত মনে করা হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দেশও আছে যেখানে বহুপত্নী-বিবাহকে ততখানিই অনুচিত মনে করা হয় যতখানি বহুপতি-বিবাহতে। এই সকল দেশের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান রহিয়াছে। ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিলে তো ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে যদি এক স্ত্রীর পক্ষে একাধিক পতি গ্রহণ অন্যায় হয়, তাহা হইলে এক পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকা ততখানিই দোষণীয়। আধুনিক প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে কোনো একটিও এরূপ নহে যাহা কেবল একটি পতি ও একটি পত্নী-বিবাহকে উচিত মনে করে ও দুপক্ষেই বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু এই যৌন সম্পর্কীয় সদাচার তো নিতান্তই বাহ্যিক বস্তু। গভীরভাবে চিন্তা করিলে অবস্থা অধিক বীভৎস বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক ধনী এবং শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রীর বর্তমানেও অনেক দাসী ও রক্ষিতা রাখেন এবং বেশ্যাগামিতা তো ধনবানের পক্ষে গৌরবের মনে করা হয়। পুরুষ এরূপ চাঞ্চল্য দেখাইলে পুরুষ বলিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বেশ্যা শব্দে যে-কালিমা তাহা কেবল স্ত্রীলোকদিগের উপরই বর্তায়। বাল্যকাল হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং চিরকাল ধরিয়া আমাদের সমাজ এইরূপ পরিবেশে পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে যাহাতে পুরুষের জন্য সদাচারের যে-কষ্টিপাথর ধার্য করা হইয়াছে তাহা দ্বারা স্ত্রীলোকের বিচার হইতে দেখিলে আশ্চর্য হই। সারা দুনিয়ায় সদাচার সদাচার বলিয়া রব উঠিয়াছে। ভারতীয়গণের এই কথা মনে করা উচিত নহে যে তাহারাই সদাচারের একচেটিয়া কারবারী। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার সকল দেশেই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ধর্মে ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তো বিশেষ করিয়া ইহার জন্য স্বর্গ মর্ত এক করিয়া তোলেন। কিন্তু একই সাথে বলা চলে যে সদাচার পালনে ধর্মানুসরণকারী এবং ঈশ্বরভক্তেরা যে-পরিমাণ অবহেলা করিয়া থাকেন সেরূপ অন্যত্র কোথায়ও হয় না। রাশিয়া হইতে ধর্ম এবং ঈশ্বরের রাজত্ব উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আপনি পৃথিবীতে ঐ একটি দেশই দেখিতে পাইবেন যেখানে বেশ্যাবৃত্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। হিন্দু

মঠ ও হিন্দু তীর্থগুলি কি আমাদের দেশের সদাচারকে সর্বাধিক পরিহাস করিতেছে না? অযোধ্যায় গিয়া সেখানকার সর্বাপেক্ষা বড় অবতার ভগবদ্ভক্ত এবং সিদ্ধ মহাত্মাকে—যিনি কয়েক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন—দেখুন, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। জানিতে পারিবেন সদাচারের ক্ষেত্রে, সদাচারের নামে সেখানে কী বীভৎস কাণ্ড ঘটে। এই স্থান স্বাভাবিক তো নহেই, বরং অস্বাভাবিক ব্যভিচারের বড় আড্ডা। বাহির হইতে আগত সাদাসিধা জনসাধারণ যাহাদিগকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং সদাচারের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া মনে করে তাহারা জঘন্য কামুকতার প্রতিমূর্তি। এই সকল লোকের মুখ হইতে ব্রহ্মচর্য এবং সদাচারের উপর লম্বা চওড়া উপদেশ শুনিয়া তো বলিয়া উঠিতে হয়—'নির্লজ্জতা, তুমি নিপাত যাও।' সাধু-সন্তদিগের এই বিষয়ে আচরণ তাহাদের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত বাণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতবর্ষে কত ধর্মসংস্থা গুপ্ত ব্যভিচারকে সহজসাধ্য করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কত ভগবদ্‌ভবন এবং ভজনাশ্রম লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে যান অথবা গুজরাটে, পঞ্জাবেই দেখুন অথবা বাঙলাদেশে, নেপালেই যান অথবা মাদ্রাজে—সর্বত্র একই ব্যাপার—সকল নাগনাথই সাপনাথ। সদাচারের সম্পর্কে যিনি যত পতিত তিনি তত সুন্দর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় ভাষণ দিতে সক্ষম হন। নগর এবং দেশের দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যেখানে আছেন সেখানেই চার দেওয়ালের ভিতরের সভ্যতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যকে সরাইয়া দেখুন। বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মচর্য এবং সদাচার সম্পর্কে নিয়ম যতই কঠিন করা হইয়াছে তাহাকে তত সহজেই ভাঙ্গা হইতেছে। আমাদের একজন রাজনৈতিক নেতা ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দেন। কিন্তু তাহার নিকটে থাকিয়াই তাঁহার ছায়াশ্রিত তাহার ভক্তগণ যে-প্রকারে ব্রহ্মচর্য ভাঙ্গিয়াই তাহার নিয়ম রক্ষা করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যখন বাঁধ দিয়া একবিন্দু জলকে রোধ করা যায় না তখন এরূপ বাঁধের প্রয়োজনীয়তাই বা কী?

সদাচার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে 'মনসি অন্যৎ বচসি অন্যৎ' (মনে এক, মুখে অন্য)। আমাদের সমাজ ভণ্ডামির অনুরক্ত ভক্ত। সমস্ত গুপ্তরহস্যের পরিচয় পাইয়া কতখানি তন্ময়তার সহিত আমরা নিজেদের মধ্যে ধর্মচর্চা করিয়া থাকি? সেই সময় মনে হয় যেন আমাদের সমাজে সদাচারকে অবহেলা করিবার মত কেহ

নাই অথবা আমরা অন্য কোনো জগতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছি। বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তবে বুঝিতে পারি যে আমাদের সমাজে ব্রহ্মচর্য এবং সদাচার এক বিরাট বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের সমাজ এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনার জোর প্রচার করিয়া কী লাভ করিয়াছে। ঔষধের সহিত রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে —সেইরূপ যত শতাব্দী অতীত হইতেছে আমাদের সদাচার ততই অধঃপাতে যাইতেছে। পরিমাণে নহে, কারণ দেশকাল ভেদে উহার কোনো পার্থক্য দেখা যায় না, তবে গোপন প্রক্রিয়ায়।

যেসকল দেশে স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বিষয়ে বন্ধন কম সেখানে লোকজনেরা এই বিষয়ে অধিক অনুকরণযোগ্য ব্যবহার করে। নিয়মকানুনের আধিক্য কেবল অন্যের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিতে আমাদিগকে অধিক চতুর করিয়াছে। রোমান ক্যাথলিকের ন্যায় আরো কত ধর্ম এই সকল অপরাধকে স্বীকার করিবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, সাধু নরনারী কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকটে মাঝে মাঝে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই প্রথা প্রচলিত করিবার কারণ এই যে অতীত ভুলিয়া নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করা। কিন্তু ইহার পরিণাম কী? প্রথম দু'একবার অপরাধ স্বীকৃতিতে যে-সামান্য সংকোচ হয় তাহাও পরে কাটিয়া যায়। মনঃস্তাত্ত্বিকেরা যথার্থই বলিয়া থাকেন যে অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি আরো উগ্ররূপ ধারণ করিয়া মানুষের অবচেতন মনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ধর্ম যাহার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছে তাহা সর্বকালে ও সর্বদেশে সকলের দ্বারা অবহেলিত হইতে দেখিলে তো ইহাই বলিতে হয় যে এই ভণ্ডামি ও বাগাড়ম্বরে কী লাভ?

আমাদের দেশে একজন মানী ব্যক্তি ধর্মের উপর গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। ভগবানের নাম জপিতে জপিতে গদ্‌গদ হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিতেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। তাহার প্রকৃত অবস্থা ইহাই যে যখন উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন তখন উৎকোচ না লইয়া তিনি কোনো কাজ করিতেন না এবং স্ত্রীলোক সম্পর্কে তো সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ যেন স্বয়ং ভগবানই তাহাকে দিয়াছেন।

এক প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষির মৃত্যুর অধিক দিন অতীত হয় নাই। তাহার

অপূর্ব ভগবদ্ভক্তি ছিল। প্রত্যূষে ঈশ্বরভক্তির উপর কোনো কবিতা রচনা না করিয়া তো তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন না। পূজাপাঠ ইত্যাদিতেও তাহার বহু সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু অন্যদিকের অবস্থা এই যে আপনার শহরে কিংবা রাজ্যে কোনো সুন্দরী স্ত্রীলোকের সন্ধান পাইলে যেকোনো প্রকারেই হউক, তাহাকে না আনাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

এক তরুণী বিধবা রানী ছিলেন। তাহার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। এক বিখ্যাত তীর্থে ভগবানের চরণে লীন হইয়া তিনি দিনপাত করিতেন। ধর্ম-উৎসব, পূজাপাঠে তো তিনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন, তাঁহার নিকট অনেক ছাত্রের আবাস ও আহার মিলিত। রানী নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যার্থীগণকে ভর্তি করিতেন। তরুণ ছাত্রেরা সারারাত্রি ধরিয়া তাহাকে তাহার পার্থিব পূজায় সহায়তা করিত। বৃদ্ধা হইবার পরেও তাহার কামতৃষ্ণা কমে নাই।

হিন্দুধর্মের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা ও বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতাররূপী মহাত্মার কথা বলিতেছি। তিনি হিন্দুধর্মের প্রচার এবং রক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজা ও ধনী ব্যক্তিগন উপস্থিত ছিলেন। ধর্মজগতে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি সেরূপ অতি অল্প লোকেরই ছিল। কিন্তু তাহার ভিতরের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন রাসলীলা করিবার জন্য যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণই নূতন রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। সুন্দরী বিধবাদিগের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আরেক মহারাজার কাহিনী। তাহার শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মপরায়ণতা, দান এবং সদাচারের প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে। কিন্তু ভিতরে দেখুন—উপাসনা, কুমারীপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে তিনি আপনার সকল কামনা পূরণের জন্য স্বাধীন ছিলেন। এই ধরনের ধার্মিক পুরুষের নিকট হইতে গৃহস্থেরা দূরে থাকিতে চাহিত।

দুই। মদ্যপান

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ধর্মই মদকে নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইসলাম ধর্ম তো নিজেকে মদ্যপানের পরম শত্রু বলে। মদ্যপানকে অতি দুরাচার বলিয়া মনে করা

হয়। কিন্তু ধনীদের মধ্যে গত তেরশত বৎসরে কয়জন এই নিয়ম পালন করিয়াছেন ? অনেক ক্ষেত্রেই মদের দোকানের মালিক মুসলমান। যেসময়ে মুসলমান রাজত্বগুলি মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে—সেসময়েও বিত্তবানের মদ্যপানে বাধা ছিল না। হিন্দুদের মধ্যেও কত সম্প্রদায় মদ্যপানকে মহাপাপ বলিয়া গণ্য করে, কিন্তু কতগুলি জাতির ধনিকেরা এই দোষ হইতে মুক্ত ? ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়—যাহার নিকটেই ব্যয় করিবার মত অঢেল অর্থ আছে—অবাধে পান করে। অন্য জাতিরা তাকাইয়া দেখে। যে-মহাত্মা মদের পিছনে লাঠি লইয়া ধাওয়া করেন তাহার শিষ্যগণের মধ্যেও বড বড় মহাপুরুষ আছেন যাহাদের গুরুদেবের সহিত এই বিষয়ে তীব্র মতভেদ বর্তমান। অবশ্য মদ নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থাদিতে তাঁহারা কাহারো পিছনে পড়িয়া থাকেন না।

তিন। অসত্য

ধর্ম এবং সমাজ সত্যভাষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমার মনে হয় সমাজে বেশি কৃত্রিমতা না থাকিলে সত্যভাষণ তত কঠিন নয়। তথাপি সত্যভাষণ এখন কত কঠিন বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই দুরূহতার কারণ আমাদের সমাজের বর্তমান গঠন। এখানে সত্যবাদীর কোনো স্থান নাই। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি মিথ্যা প্রচারের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। লোককে প্রতারিত করিবার জন্যই মিথ্যার ব্যবহার হয়। নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিয়া অপরকে প্রতারিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং রাজনীতিবিদেরা পরম কর্তব্য জ্ঞান করেন। রাজনৈতিক অভিধানে অসত্যভাষণকে পাপ বলিয়া গণ্য করা হয় না। আমাদের সমাজ এবং ধর্মের সত্যভাষণের উপর অধিক জোর দেওয়া বৃথা যখন অপরদিকে লোকদিগকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য করা হয়। বিদ্যালয়ে একটি বালক দোয়াত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। অপরাধ স্বীকার করিলে ভৎর্সনা শুনিতে ও শাস্তি পাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু মিথ্যা বলিলে সাথে সাথেই রেহাই পায়। মারামারি ও অন্যান্য অপরাধ করিয়া যে মিথ্যা বলিতে পারে লাভ তাহারই হয়। সুতরাং কে সত্য কথা বলিয়া শাস্তি ভোগ করিতে চাহিবে ? বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিয়া আজকাল ভরপেট আহার মেলা কঠিন। সত্যকথা বলিয়া বন্ধুত্বলাভ অসম্ভব। এই কারণেই লোকেরা

মিথ্যা কথা বলিতে বদ্ধপরিকর হয়। আজকাল বিপুল সম্পত্তি, উচ্চপদ, উচ্চ সম্মান নৈপুণ্যের সহিত মিথ্যাভাষণের পারিতোষিক। আমাদের সমাজে প্রতি ক্ষেত্রেই ভিতরের ও বাহিরের চেহারা আলাদা। বলিবার জন্য এক সদাচার, পালন করিবার জন্য অন্য। যে-পর্যন্ত সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা এইরূপ, একজন দরিদ্র কী করিয়া ইহার হাত হইতে বাঁচিতে পারে? পুঁজিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বহু বন্য জাতিকে আমাদের নিচে বলিয়া মনে করা হয় কিন্তু ইহাদের মধ্যে অসত্য ভাষণ অতি অল্পই। ইহার অর্থ এই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত হইয়া আমাদের সমাজকে সত্যের ক্ষেত্র হইতে আরো নিচে লইয়া যাইতেছে। আমাদের সমাজ ছলনা ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে যে-অনুপাতে প্রশ্রয় দিয়াছে সেই অনুপাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চিন্তাধারাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। সমাজের প্রত্যেকটি লোক নিজের জন্য না চাহিলেও যে-ভাবেই হউক অপরকে প্রতারিত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে চাহে। কেহ কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এবং ইহার পরিণাম—স্ত্রী পুরুষকে বঞ্চিত করিতে চাহে, পুরুষস্ত্রীকে। পিতা পুত্রকে প্রতারিত করে ও পুত্র পিতাকে। শেষ পর্যন্ত এই প্রকারের প্রতারণার অরাজকতার জন্য দায়ী কে?

চার। চৌর্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণ

প্রাচীনকালে চুরির জন্য চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া হইত, হত্যা পর্যন্ত করা হইত। আজকাল শাস্তি খানিকটা লঘু হইলেও সমাজের পক্ষ হইতে চুরিকে বড় পাপ মনে করা হয়। ইহারও জন্য কঠিন আইন এবং মজবুত জেলখানা তৈয়ারি হইয়াছে। সরকার পুলিসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। বড় বড় বেতনধারী বিচারক ও শাসক ইহার জন্য নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ইহাতে কি যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে? যাহাদের উপর চুরি বন্ধ করিবার ভার পড়িয়াছে তাহারা নিজেরাই যদি চুরি করে তাহা হইলে চুরি কী করিয়া বন্ধ হইবে? পুলিস মনে করে চোর ধরিবার ও চুরি বন্ধ করিবার দায়িত্ব তাহার। কিন্তু শুধু চৌকিদার, কনস্টেবল নহে; দারোগা, ইন্‌সপেক্টার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সবকিছু চাপা দেন। প্রত্যেকেই জানে শতকরা নব্বই জন দারোগা

উৎকোচ গ্রহণ করে। গ্রামে একথা কাহার অজানা? পুলিস কিছু চোরকে অবশ্যই জেলে পাঠায় কিন্তু কেহ কি কখনো হিসাব করিয়া দেখিয়াছে কত প্রকৃত অপরাধীকে পুলিস ঘুষ লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে? জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত ঘুষের বাজার এইরূপ গরম ততদিন চুরি কী করিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে? ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার কথা যে যে-লোকদিগের নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রতিমাসে অনেক অর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহারাও যদি অবৈধ উপায়ে আয় করা বন্ধ না করে তাহা হইলে ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত চোর নিজেকে কী করিয়া সামলাইয়া রাখিবে?

অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের জন্য জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। কোনো এক সময়ে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রণা দ্বারা অপরাধীকে ভীতি প্রদর্শন, কিন্তু আধুনিক জগৎ কয়েদ এবং শাস্তিকে সংশোধনের সুযোগ বলিয়া মনে করে। এই জেলগুলির অবস্থা কিরূপ? কয়েদি সেখানে গিয়া দেখিতে পায় যে ছোট সিপাহি হইতে আরম্ভ করিয়া সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত কয়েদিদের বরাদ্দ হইতে কিছু-না-কিছু নিজের ভোগে লাগাইতেছেন। তিনমন চাউল হইতে আধমন সরানো হয়। আটায় ভুষি ও মাটি মিশানো হয়। ভাল তরিতরকারি উচ্চকর্মচারীদের উপঢৌকনের জন্য সরাইয়া রাখা হয়। সাধারণ তরিতরকারি হইতেও এক ভাগ অন্যে নেয় এবং কয়েদিদের ভাগ্যে পড়ে ঘাসপাতা। তেল দুধ ঘি গুড় প্রভৃতি সকল খাদ্যবস্তু হইতেই চুরি হয়। সিগারেট এবং তামাক বর্জন করিয়া সরকার কয়েদিদের সংযম শিখাইতে চাহেন, কিন্তু ইহার পরিণাম এই হয় যে যাহার অর্থ আছে তাহার পক্ষে এগুলি একটু বেশি দামী হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যে-কয়েদির কাছে ঘুষ দিবার মত পয়সা আছে তাহার জন্য জেলে সমস্ত রকম ব্যবস্থাই হইয়া যায়। এই ধরনের পরিবেশে কোনো সংশোধন হইতে পারে না।

পাঁচ। ন্যায়বিচার

সর্বকালে ন্যায়বিচারের ঢক্কানিনাদ করা হয়। সমাজ এবং সমাজের নেতা বিত্তবান-দিগের তরফ হইতে বিত্তহীনের প্রতি কত অন্যায় করে তাহার সম্পর্কে আমরা

পূর্বেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে বিভিন্ন সরকারগুলি কতটা ন্যায় করিতেছে তাহাও খানিকটা দেখা দরকার। আধুনিককালে সরকার বিচারালয় এবং আইন প্রণয়নে বিশেষ মনোযোগ দেন। বলা হইয়া থাকে যাহাতে সকলেই সুবিচার পায় তাহার জন্যই এই সকল বন্দোবস্ত। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার কি সুবিধা আছে? যেসময় বিচারালয় ছিল না, কেবলমাত্র পঞ্চায়েত ছিল; আইন ছিল না, কেবল ব্যবহারিক বুদ্ধিই সকল কিছু নির্ণয় করিত; উকিল ছিল না, প্রত্যেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিত—সেই সময় গরিবের পক্ষে সুবিচার পাওয়া অনেক সহজ ছিল। আইন ন্যায়কে সহজে বুঝিতে সাহায্য করে না, উপরন্তু ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। আইনের মারপ্যাঁচে সহজও জটিল হইয়া যায়। বলা হয় যে আইন সাধারণ বুদ্ধির ভিত্তিতেই রচিত, কিন্তু এখন আইনের কাজই হইতেছে সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধিকে অচল করিয়া দেওয়া। সূক্ষ্ম প্রতিভা—যাহা সমাজের হিতের জন্য কাজ করিতে সমর্থ, আজ কূটতর্কে ভরা আইনের অর্থকে অনর্থ করিবার কাজে তৎপর। মিথ্যা মোকদ্দমাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাতেই শ্রেষ্ঠ উকিলের প্রশংসা হয়। আমরা দিনদুপুরে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলিয়া দেখিতে পাইতেছি।

আইন এবং বিচারালয় ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের প্রতি সুবিচার করিতে অক্ষম ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের সর্বত্র ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। সাধারণ অপরাধের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক, হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয়। জমিদার অথবা ধনীর ইঙ্গিতমাত্র নরহত্যা করা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি টাকার থলি চিকিৎসকের সম্মুখে ধরিয়াছে। চিকিৎসক ভাবে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। লিখিয়া দেয় হৃদয় দুর্বল ছিল, আঘাত সামান্যই ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি, আর মামলাও ভিন্নরূপ ধারণ করে। অনেক সময়েই মৃতদেহ লইয়া গিয়া শীঘ্র পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভনের দ্বারা সাক্ষীগণকে নিজের পক্ষে আনা হয়। প্রায়ই দরিদ্রেরা আদালত পর্যন্ত যায় না। যদি ধনী দ্বারা সংঘটিত তিনটি হত্যাকাণ্ডের ভার কোনো দারোগার উপর পড়ে তাহা হইলে তাহার ভাগ্যই খুলিয়া যায়। সে এরূপ পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়া লয় যে যদি তাহার চাকুরিটি চলিয়া যায় তাহা হইলেও সারাজীবন সে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিবে।

বিহারের এক বড় জমিদারের কথা বলিতেছি। তাহার লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। এই আয় তাহার পিতা তাহার জন্য জালিয়াতি করিয়া যোগাড় করে। সেসময় সে তরুণ বালক। স্বজাতীয় একটি দরিদ্র বালক তাহার নিকটে থাকিত। একদিন কোনো কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তরুণ জমিদার ঐ ছেলেটির উপর পিস্তল চালাইল। বালকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। মৃতদেহ পোড়াইয়া ফেলা হইল এবং থানার দারোগাকে ডাকাইয়া আনাইয়া বেশ মোটা টাকা দেওয়া হইল। সেই স্তূপীকৃত টাকা দেখিয়া তো দারোগার চক্ষু জলজল করিয়া উঠিল। পরে সেই দারোগাই চাকরি ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দুজনে একসাথে কাজ করিতাম। তিনিই বলিয়াছিলেন কীভাবে রাতারাতি মৃত তরুণটির পিতা যে-গ্রামে থাকিত সেই গ্রামে গিয়া নানাভাবে বোঝান। কীভাবে উচ্চপদস্থ ও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে অর্থ বণ্টন করিয়া সরকারি কর্মচারীরা আইন এবং সুবিচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল। হত্যা হইয়াছে এই খবর পর্যন্ত আদালতে পৌঁছিতে পারে নাই। যে-তরুণ আপনার খেলার সঙ্গীকে পিস্তলের দ্বারা হত্যা করিতে পারে সে সাধারণ অপরাধীর মত নহে। যদি সে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে হত্যার জন্য কোনোপ্রকারে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বাঁচিয়া গেলেও তাহাকে প্রদেশের বড় বড় জেলখানায় জন্ম-হইতেই-অপরাধপ্রবণ কয়েদির মধ্যে স্থায়ীভাবে জীবন কাটাইতে হইত। কিন্তু আজ তিনি প্রদেশের বড় প্রতিপত্তিশালী ধনী নেতা।

অপর একটি জমিদারের কথা। তিনি নিজের প্রতিপত্তির জন্য আশেপাশের অনেক গ্রামেই বিখ্যাত ছিলেন। কথায় তো ভারতবর্ষে ইংরাজদের রাজত্ব, কিন্তু যেখানে তাহাদের জমিদারির সহিত সম্পর্ক সেখানে ইংরাজের স্থান দ্বিতীয়। সাধারণ মারপিটের তো কথাই নাই, বড় বড় মোকদ্দমায় পর্যন্ত জমিদার জরি-মানা লইয়া মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। আর তাহার রায়ের বিরুদ্ধে যাইবার মত স্পর্ধা কাহার? এই জমিদারের গ্রামে একজন একটি ময়না পুষিয়াছিল। ময়না মানুষের মত কথা বলিত। এ-খবর জমিদারের নিকট পৌঁছে, তৎক্ষণাৎ ময়না চাহিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পৃথিবীর অভি-জ্ঞতা হইতে এই দরিদ্রের শিক্ষালাভ ঘটে নাই। পালিত পশুপক্ষীর প্রতি-মানুষের অপত্য স্নেহ জন্মায়। সেই স্নেহে অন্ধ হইয়া সে ময়না দিতে অস্বীকার

করিল। এই খবর জমিদারের কানে যাওয়াতে তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, সাথে সাথেই এক পালোয়ান সিপাহিকে লোকটিকে হত্যা করিয়া ময়না কাড়িয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। সত্য সত্যই হতভাগ্যকে হত্যা করিয়া জোর করিয়া ময়না আনা হইল। মোকদ্দমা আদালতপর্যন্ত গড়াইল বটে, কিন্তু জমিদারের একদিন মাত্র হাজতবাস হইল।

পাটনা, গয়া জেলার জমিদারেরা নিজেদের অত্যাচারের জন্য সারা বিহারে কুখ্যাত। সেখানকার এক জমিদারের সংকল্প ছিল যে যতদূর সম্ভব তাহার জমিদারিতে কোনো কৃষক যেন জমির স্বত্ব না পায়। তিনি প্রত্যেক গ্রামে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাইয়া, মারপিট করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে চাষিদের উত্যক্ত করিয়া তাহাদের জমির স্বত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেন। অধুনা যাহার নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে এমন একটি গ্রামে প্রায় সকল কৃষকই জমির স্বত্বত্যাগ করিয়া জমিদারের জমিতে চাষ করিবার অধিকারী রায়তে রূপান্তরিত হয়। সেই গ্রামে একঘর কৃষক-পরিবার ছিল। তাহাদের খাওয়া-পরার জন্য পর্যাপ্ত জমি, সম্পত্তি ছিল এবং পরিবারে কয়েকটি কর্মক্ষম যুবাপুরুষ ছিল। এই পরিবারকে হটাইতে গিয়া জমিদারকেই কয়েকবার নাকাল হইতে হয়। তাহার ফলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে এই পরিবারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া তাহাদের ভিটায় যদি তিনি ঘুঘু না চরান তো তাহার নামই নাই। এইবার অন্য কোনো গ্রাম হইতে এক মুমূর্ষুকে আনিয়া সেই গ্রামে মারা হইল এবং ঐ পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হইল। পুলিস প্রত্যক্ষদর্শীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিল। পরিবারের সকল সমর্থ পুরুষগণকেই জেলখানায় আটক রাখা হইল। মোকদ্দমা চালাইতে গিয়া তাহাদের সম্পত্তি শেষ হইয়া গেল। লোকগুলির দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি হইল। পরিবারে অবশিষ্ট রহিল স্ত্রীলোকেরা। তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ রোগে ও ক্ষুধায় কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা পড়িল। মেরামতের অভাবে গৃহ ধসিয়া পড়িল। তাহার উপর রোপিত ভেরেণ্ডা গাছগুলি কয়েকবৎসর পরে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহাই আধুনিক আইনের কেরামতি এবং আধুনিক ন্যায়ের নমুনা।

ন্যায় সহজ এবং সুলভ নহে, অধিকন্তু প্রবল শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহা পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু। ইহা এরূপ ব্যয়বহুল যে ধনী ব্যক্তির পরাজয়েও দরিদ্রের সর্বনাশ হয়। স্ট্যাম্পের পয়সা জোগাইতে না পারিলে তো দরিদ্র ব্যক্তি

আদালতে দরখাস্ত পর্যন্ত করিতে পারে না। আর কেবলমাত্র স্ট্যাম্পই তো যথেষ্ট নহে। উকিল-মোক্তারের দর্শনী, পেশকার, সেরেস্তাদার, আরদালি ও চাপরাশিকে ঘুষ। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বড় বড় আইনজ্ঞকে নিযুক্ত করেন। যদি তুমি কোনো মামুলি উকিলকে দাঁড় করাও তো জোরালো মোকদ্দমাও কাঁচিয়া যাইবে। বাড়িঘর জমিজায়গা বিক্রয় করো, গহনাপত্র বাঁধা দাও, যেভাবেই হোক টাকা খরচ করো, মোকদ্দমার তদবির করো। যদি মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হয় এবং একটিমাত্র হয়, তাহা না হইলে ফৌজদারী মোকদ্দমার তো সীমা-পরিসীমা নাই। মারপিট, চড়াও, অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি কয়েকটি মোকদ্দমা এ-আদালতেও একই সাথে চলিতেছে। মুন্সেফের নিকট হইতে নিষ্পত্তি যদি পক্ষকালের মধ্যে হইল তাহা হইলে আপিল হইল সাব-জজের নিকট। সেখানেও যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে হাইকোর্ট এবং তাহার পরে প্রিভি কাউন্সিল। ফৌজদারী মোকদ্দমা পৃথক চলিতেছে। যদি প্রত্যেক এজলাসে খরচ করিবার মত টাকা না থাকে, তাহা হইলে তোমার জয়ও পরাজয়ে পরিবর্তিত হইবে।

ইহা তো গেল সেই সময়কার কথা যখন হাকিমেরা বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে কতজন আছেন যিনি দ্রুত ধনী হইতে চাহেন না? যিনি মাসিক আড়াইশ টাকা বেতন পান তিনিও মোটর রাখিতে অভিলাষী। তাঁহারো আকাঙ্ক্ষা সস্ত্রীক জাঁকজমকের সহিত বাস করা। তাহার পুত্রকন্যানবাবপুত্রীকেও হার মানায়। তাঁহার গৃহে রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য দেখা দিক। উৎসবে, পর্বে তিনি নবাবের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া দেখাইতে পারেন। পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিদ্যালয় এবং কলেজের অনুসন্ধান করেন। বিবাহ উপলক্ষে মোটা যৌতুক দেন এবং দুই হস্তে মোহর ছড়ান। তাঁহার নিমন্ত্রণে বড় বড় হাকিম এবং অভিজাতেরা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের জন্য দেশীবিদেশী সর্বপ্রকারের সুস্বাদু ভোজন ও পানীয় পরিবেশিত হয়। আমাদের হাকিমদের যখন ইহাই আন্তরিক বাসনা তখন অর্থের চাকচিক্য তাহাদের কেন আকৃষ্ট করিবে না? যদি কাহারো উৎকোচ-গ্রহণে সংকোচ দেখা যায় তাহা হইলে এইজন্য যে তাহার পরিমাণ কম, অথবা গুপ্তরহস্য গোপন করিয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন হইবে বলিয়া। অনুচিত মনে করিয়া যাহারা উৎকোচ গ্রহণে বিরত থাকেন, এরূপ

লোকের সংখ্যা বিরল। জেলার অল্প মাহিনার কর্মচারীদের কথা বাদই দিন। উচ্চ-আদালতের বিচারককে পর্যন্ত উৎকোচ গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আর যাহারা মোকদ্দমা করে তাহাদের এ-খবর ভাল করিয়াই জানা। প্রদেশশাসক এবং ভারতশাসককে পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, অত্যন্তমূল্যবানহার এবং অন্যান্য দামী দামী উপঢৌকন দিয়া নিজের কার্যসিদ্ধি করা হইয়াছে। কোনো একটি দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে কয়েকটি জোরালো প্রমাণ জড়ো হইয়াছিল। নথিপত্র বিভাগের কর্মচারীকে একত্রে কয়েক লক্ষ মুদ্রা দেওয়া হইল এবং পরের দিন দেখা গেল সকল প্রমাণ উধাও।

অধুনা অর্থেরই রাজত্ব। যাহার নিকটে অর্থ আছে শাসনের উপর অধিকার তাহারই। যাহাদের নিকটে অর্থের থলি, তাহারাই আইনপ্রণেতা। ইংলণ্ডের ধনী ব্যক্তিরাই ভারতবর্ষের মালিক। তাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করে এমন আইন তাহারা সুনজরে দেখেন না। দেশে-বিদেশে গমনাগমনের উপায় জাহাজ এবং রেল এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হয়। ভারতবর্ষের রেলকে এক পৃথক কার্যবিভাগের অধীন এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে যে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণের কোনো প্রভাব যেন ইহার উপর পড়িতে না পাবে। এখন তো আইনের আধিক্য দেখা দিয়াছে। প্রতিবৎসর আমাদের দেশে শত শত আইন রচিত ও সংশোধিত হয়। কিন্তু মানুষ সততার দ্বারা স্বোপার্জিত সম্পত্তি যাহাতে নিজেই ভোগ করিতে সমর্থ হয় এগুলি তাহাদের জন্য নহে। ইহাদের উদ্দেশ্য—কী প্রকারে ধনিকদিগের চালু এই শাসনে সহায়তা দিবার জন্য আরো কিছু যোগ্য লোককে ক্রয় করা চলে। কীরূপে আরো কিছু মুখর শ্রেণীর মুখ বন্ধ করা চলে। যোগ্যতা-সম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আপন যোগ্যতা দ্বারা জনগণের সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় না, নিযুক্ত করা হয় কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবার জন্য। সকলেই জানে সরকারি চাকুরিগুলিতে লোকেরা অধিক বেতন এবং স্থায়ী জীবিকা লাভের জন্য ছোটে। যদি সরকারের ধন ন্যায়বিচারের সহিত বণ্টন করিতেই হয় তাহা হইলে তাহার বড় দাবিদার তো দরিদ্রের সন্তানেরা। কিন্তু আমরা কী প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রথমে তো দরিদ্র সন্তানের পড়াশুনা করাই কঠিন। শিক্ষা-লাভ করিয়া যোগ্যতা অর্জন করিবার পরেও বড় চাকুরির জন্য সে সুপারিশ যোগাড় করিতে পারে না। পরিণাম ইহাই হইয়াছে যে সকল রকমের বড় চাকুরি

লক্ষপতি, ক্রোড়পতি, বড় বড় জমিদার, রাজা বা নবাবদের পুত্রদের সম্পূর্ণ দখলে। আই সি এস, আই পি এস, আই এম এস ইত্যাদি উচ্চ কর্মচারীগণের তালিকা দেখিলে বুঝিবেন যে কেবল ধনী জমিদার, মহাজন এবং প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিজ্ঞের পুত্রেরাই আছেন। পিতা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ও এক দেশীয় রাজ্যের বড় মন্ত্রী এবং পুত্র সরকারের একটি কার্যবিভাগের সচিব। সমগ্র ভারতের রাজকর্মচারীদের মধ্যেই নহে, প্রদেশের সকল উচ্চপদই তাহারা লাভ করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশেরই জীবিকালাভের অন্য স্বাধীন উপায় বর্তমান। যাহারা সরকারকে চালিত করেন সেই উচ্চপদধারীরা ধনিকশ্রেণী হইতে উদ্ভূত, তখন ধনী-দরিদ্রের প্রশ্নে সে নিজ শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিবে—ইহা সম্ভব নয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে বিগত দেড়শত বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে ইহাই বলে যে যেখানে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের প্রশ্ন ওঠে সেখানে তাহারা ন্যায়বিচারকে শিকায় তুলিয়া রাখে। কত নিরপরাধ ভারতীয় ইংরাজদের বুটের আঘাত এবং গুলির শিকার হইয়াছে, কত মোকদ্দমায় ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। সাহেবের পদাঘাতে মৃতব্যক্তির প্লীহা চিকিৎসকের পরীক্ষায় বড় পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ ন্যায়বিচারের অভিনয় ধনী-দরিদ্রের মামলায় বিচারকের পদে আসীন ধনী সন্তানদের দেখা যায়। জমিদার এবং কৃষক, শ্রমিক এবং মিলমালিকদের বিরোধে আমাদের যে-তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাহাদের সহানুভূতি সর্বদাই বিত্তশালীদের দিকে। মারপিট, দাঙ্গার প্রস্তুতি প্রবল শক্তিশালী জমিদারদিগের তরফ হইতেই হইয়া থাকে। নিজের জীবিকা হারাইবার আশঙ্কায় কৃষক শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইহার বিরোধিতা করে। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় যে পুলিস এবং ম্যাজিস্ট্রেট কৃষককে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাদের উপরই ১০৭ অথবা ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জমিদারই মারপিট ও দাঙ্গা লাগাইয়াছে, তথাপি তাহার কোনো লোককে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না।

এক জায়গায় একটি হালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। পুরুষানুক্রমে যাহারা চাষ করিয়া আসিয়াছে এরূপ কৃষকদের জমি জমিদার কাড়িয়া লইতে চাহিল। কৃষকেরা ভাবিল যদি জমি হাতের বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা কী করিয়া প্রাণধারণ করিবে? তাহারা মার খাইয়াও জমি ছাড়িতে চাহিল না। জমিদার থানায় হুলিয়া লেখাইল। কৃষকদের অভিযোগ দারোগা সিপি-

বন্ধ করিতে অস্বীকার করিল। দারোগা জমিদারের পক্ষ লইয়া কয়েকজন কৃষকের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইল। ফৌজদারী আদালতের রায় দলিল দেখিয়াই দেওয়া উচিত। ম্যাজিস্ট্রেটের জমিদারের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইল। কৃষকেরা শুধু প্রতিবাদই করিয়া গেল যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখুন, ক্ষেতের উপর অধিকার আমাদেরই। যিনি দুইশত বা চারিশত বিঘায় ফসল উৎপন্ন করেন সেরূপ কেহ এক একর জমির এক-চতুর্থাংশে কি এক-পঞ্চমাংশে পৃথক করিয়া ফসল লাগান না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে গিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের উপর ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। উপরন্তু বারংবার প্রার্থনা সত্ত্বেও কর্মচারীবৃন্দও ক্ষেত দেখিতে যাওয়া দরকার মনে করিল না। ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ই বহাল রহিল। সমস্ত দিক হইতে সুবিচারের পথ বন্ধ দেখিয়া কৃষকেরা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিল। দিন স্থির হইল। পুলিস এবং হাকিমেরা জানিত যে জমিদারের পক্ষ হইতে বড় মারপিটের আয়োজন চলিতেছে। তাহাদের ইহাও অজ্ঞাত ছিল না যে কৃষকেরা সকল অবস্থাতেই শান্তিপূর্ণ থাকিতে উৎসুক। তাহারা ইহাও জানিত যে এই বিবাদে অংশগ্রহণ করিবার জন্য জমিদারের হস্তিগুলিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। নির্ধারিত দিনে কয়েকশত লোক হাতি, লাঠি ও সড়কি লইয়া একত্রিত হয়। কৃষকদিগের পক্ষ হইতে মাত্র কয়েকজন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী; জনসাধারণকে অধিক সংখ্যায় না আসিবার বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল। মাত্র এগার জন কৃষক ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হইল। হাতি এবং লাঠি হাতে জোয়ানদের লইয়া জমিদার সত্যাগ্রহীদের উপর হামলা করিবার জন্য ক্ষেতে পৌছিল। অধিক সংখ্যক পুলিসেরই সেখানে কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। গ্রেপ্তারের পর সত্যাগ্রহীরা পুলিস হেফাজতে থাকাকালিন জমিদারের লোক এক সত্যাগ্রহীকে লাঠি মারে। মস্তক হইতে রক্তের ধারা নামিল। আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে কিন্তু অল্পক্ষণবাদেই সরকারি কর্মচারী তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অন্ধও বলিতে পারিত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সমস্ত প্রস্তুতিই জমিদার করিয়াছে। কিন্তু জমিদারের কোনো একটি লোককেও গ্রেপ্তার করা হইল না বা তাহার এই সকল কার্যকলাপে কোনো বাধা দেওয়া হইল না। তাহার এই লাঠিয়ালদিগকে সরকারি আইন নিজের হাতে তুলিয়া লইবার জন্য এই অবাধ স্বাধী-

নতা দেওয়া হইল।

অপর একটি জমিদারের কাহিনী হইতেই বোঝা যাইবে ধনীর নিকট ন্যায় এবং আইনের কী প্রকার দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। তাহারা চাহে না যে কৃষক জমির উপর কোনো স্বত্ব পায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া কৃষক জমির চাষ করিয়া আসিয়াছে। বহুবিধ প্রয়াস সত্ত্বে কৃষক জমিতে স্বত্ব লাভ করে। জমিদার তাহাতে মামলা মোকদ্দমা এবং জোরজুলুমের ব্যবস্থা করে। কৃষকেরা জানিত যে এরূপ প্রবল জমিদারের সহিত বিরোধ করিতে গিয়া তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই কারণে তাহাদের অধিকাংশই রেজেষ্ট্রি করিয়া জমিতে তাহাদের অধিকার ত্যাগ করিল। আমি সেই সকল রেজেষ্ট্রি করা ত্যাগপত্রের তাড়া দেখিয়াছি। দেখিবার সময়ে মনে হইতেছিল এই সকল দরিদ্রের কাছে ন্যায় ও সুবিচারের অর্থ কী? যদি ন্যায়বিচার পাইবার সামান্যতম আশাও তাহাদের থাকিত তাহা হইলে নিজেদের এবং সন্তানদের জীবিকার একমাত্র সম্বল এই জমির উপর অধিকার তাহারা কেন ত্যাগ করিবে?

জুয়াকে আইনবিরুদ্ধ মনে করা হয়। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের বাজি কী? যেহেতু উহাতে বাদশাহ্ পর্যন্ত হাজির থাকেন সেজন্য ঘোড়দৌড়ের জুয়া বিধি-সম্মত। বড় বড় লটারিগুলি কী? ছোট ছোট জুয়াখেলা তো সর্বদাই পুলিসের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। বড় বড় জুয়ার আড্ডার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তো রাজ্যের কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। ইহাই কি ন্যায়? আশ্চর্যই বটে!

ছয়। সংস্কৃতি ও ইতিহাসাভিমান

ইতিহাস ও সংস্কৃতির রব তোলা হয়। মনে হয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বুঝি কেবল সুখ ও মধুময়! আমার নিজের সমাজের অভিজ্ঞতাও তো পঁচিশ বছরের। ইহাই তো পরে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য ইতিহাস হইবে। আজ যে-অত্যাচার আমরা দেখিতে পাইতেছি, হাজার বৎসর পূর্বে কি তাহা এখন হইতে কম ছিল? আমাদের ইতিহাস তো রাজা এবং পুরোহিতের ইতিহাস, তাহারা সে-যুগেও আজিকার মতই সুখে দিন অতিবাহিত করিত। যে-অগণিত মানুষ নিজেদের রক্তে তাজমহল এবং পিরামিড নির্মাণ করিয়াছে, নিজ অস্থিমজ্জা দ্বারা প্রস্তুত

আতরে নূরজাহানকে সিক্ত করাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিয়া পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুরে সংযুক্তাকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ ইতিহাসে কোথায়? ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছিলেন সেই সংখ্যাহীন বীরগণের শৌর্য বীর্যের কোনো চিহ্ন কি পাওয়া যাইবে? বিদেশী লুণ্ঠনকারীগণের জন্য বিরাট বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, নানা গ্রন্থে তাহাদের প্রশংসার ছড়াছড়ি। গত মহাযুদ্ধেই কোটি কোটি মানুষ বলি হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস কতজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে?

তাই এই ইতিহাস আমাদের সমাজে প্রাচীন শৃঙ্খলকে আরো দৃঢ় করে। আমাদের চিন্তার স্বাধীনতার পরম শত্রু এই ইতিহাস। আমাদের প্রাচীন বৈরিতা এবং অনৈক্যকে সে সজীব করিয়া রাখে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষের পরম শত্রু বলিয়া প্রমাণিত ধর্ম বহুলাংশে ইতিহাসের ভিত্তির উপর টিকিয়া আছে। বিশ্বামিত্র অথবা বশিষ্ঠ, মনু অথবা যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস অথবা পতঞ্জলি, নানক অথবা কবীর, মোসেস অথবা যিশু—সকলেই বহুদিন ধরিয়া এই পৃথিবীতে ছিলেন। না জানি কত মানুষকে তাঁহারা দুঃখ দিয়াছিলেন, না জানি কত লোকের অধিকার তাঁহারা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, না জানি কত দাসদাসী তাঁহারা ক্রয় করিয়া তাহাদের আজীবন পশুর ন্যায় পরিশ্রম করাইয়াছিলেন? প্রভু এবং অন্নদাতাদের চাটুকারিতার জন্য তাঁহারা আরো অনেক দুষ্কর্ম করিয়া থাকিবেন। সফল লুণ্ঠনকারী ও হত্যাকারীগণকে প্রশংসার স্বর্গে উঠাইবার যে-আগ্রহ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ইতিহাসের বীরপূজায় ইহাদের অংশ বিরাট।

হিন্দু-ইতিহাসে রামের স্থান বহু উচ্চে। আধুনিক কালে আমাদের নেতা গান্ধীজী সময়ে অসময়ে রামরাজ্যের দোহাই দিয়া থাকেন। সেই রামরাজ্যের রূপ কী হইতে পারে যেখানে হতভাগ্য শম্বুকের অপরাধ কেবল ইহাই যে সে শূদ্র হইয়াও ধর্মলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিল এবং তাহার জন্য রামের ন্যায় অবতার ও ধর্মাত্মা নৃপতি তাহাকে হত্যা করেন? সেই রামরাজ্য কীরূপ হইতে পারে যেখানে একটি লোকের কথায় নির্ভর করিয়া তিনি গর্ভবতী সীতাকে বনে পাঠাইলেন? রামরাজ্যে দাসদাসীর অভাব ছিল না। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে দাসপ্রথা কী নিষ্ঠুরতার সহিত প্রচলিত ছিল সে-সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান আছে। সেসময়ে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে স্বেচ্ছায় শুধু বিক্রয়ই করা

যাইত এমন নহে, সমুদ্র এবং বড় বড় নদীর ধারের গ্রামগুলিতে লোকজনকে ধরিয়া আনিবার জন্য হামলা হইত। দস্যুরা অতর্কিতে গ্রাম আক্রমণ করিত এবং ধন-দৌলতের সহিত সেখানকার কর্মক্ষম লোকজনদিগকেও ধরিয়া লইয়া যাইত। পর্তুগীজ দস্যুরা এইভাবে প্রতি বৎসর হাজার হাজার দাস ধরিয়া ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রদেশে বিক্রয় করিত। রামরাজ্যে যদি এই প্রকারের লুণ্ঠন আর রাহা-জানি নাও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও দাসপ্রথা বর্তমান ছিল। মাত্র দশ কি বার বৎসর পূর্বে হিন্দুদিগের গর্ব নেপালরাজ তাহার রাজ্যে দাসপ্রথা বন্ধ করিয়াছেন।* মিথিলাতে এখনো কত পরিবারে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল পাওয়া যায়। দারভাঙ্গা জেলার বহেরা থানার অধীন তরোনী গ্রামে দিগম্বর ঝায়ের প্রপিতামহ কুল্লীমণ্ডলের পিতামহকে অন্য কোনো মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল এবং দিগম্বর ঝায়ের পিতামহ পঞ্চাশ টাকা মুনাফায় তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেন। এখন হইতে মাত্র তিন পুরুষ পূর্বে ইংরাজ রাজত্বেও এই প্রথা বর্তমান ছিল এবং হিন্দু অথবা মুসলমান প্রকৃত ধার্মিক যখন মনুস্মৃতি অথবা হদীশে দাসদিগের উপর মালিকের অধিকারের বিষয়ে পড়িতে থাকেন তখন তাহাদের জিহ্বায় জল না আসিয়া পারে না।

আসুন, একবার রামরাজ্যের দাসপ্রথার প্রাত দৃষ্টিপাত কার। একটি সাধারণ বাজার—ইহাতে শুধুই দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় হয়। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের বাগান। ভোজনের দ্রব্যসমূহ দোকানে সজ্জিত। ভেড়া ছাগল এবং শিকারলব্ধ পশুর মাংস ছাড়াও উচ্চবর্ণের আর্যদিগের ভোজন তথা মধুপর্কের জন্য গোমাংস বিশেষরূপে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় হইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজেদের তাঁবু ফেলিয়াছেন।

কেহ কেহ নূতন দাসদাসী ক্রয় করিতে আসিয়াছে। কাহার দুর্দিন পড়িয়াছে, সে নিজের দাসদাসীদিগকে বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ টাকা পাইতে চাহে। কেহ মাত্র পুরাতন দাসদাসী বিক্রয় করিয়া নূতন পাইবার খেয়ালে তাহার দাস-দাসীদের মেলায় আনিয়াছে। যাহারা শীঘ্র বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতে চাহে তাহাদের দাসদাসীকে অল্প দামে বড় ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া লয় এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। দাসের মালিকেরা অনেক মাস পূর্বেই মেলায় যাওয়া স্থির

* ১৯২৬ সালে নেপালে দাসপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়—অনুবাদক।

করিয়া আপন দাসদাসীকে সুখাদ্য দিতে আরম্ভ করে, যাহাতে মাংস ও চর্বিতে তাহাদের অস্থি আচ্ছাদিত হয় এবং তাহারা বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রিত হইতে পারে। তাহাদের সাদা চুলকে কালো করা হইয়াছিল এবং বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়া তাহাদের বাজারে আনা হইয়াছিল। কোনো কোনো স্থলে কেহ নিজেদের দু'একজন দাস অথবা দাসীকে লইয়া বসিয়াছিল এবং কোনো কোনো স্থলে একশত বা দুইশতের পংক্তি বসিয়াছিল। ক্রেতার ভিড় ছিল। ক্রেতারা বলিতেছিল, আজ বাজার খুব চড়া যাইতেছে। গত বৎসর অষ্টাদশী স্বাস্থ্যবতী দাসী দশ টাকায় পাওয়া যাইত, এবার তো ত্রিশ টাকাতেও পাওয়া কঠিন। একটি লোকের দাসী ক্রয়ের প্রয়োজন কিন্তু তাহার নিকটে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। সে এক চল্লিশ বৎসর বয়স্কা সওদার নিকটে হাজির হইল। দাসীর তিন-চতুর্থাংশ কেশ সাদা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে কলপের সাহায্যে কালো করা হইয়াছিল। মালিকের সৌভাগ্যক্রমে দাসীটির সমস্ত দাঁতগুলিই শক্ত ছিল। ক্রেতা নিকটে গিয়া তাহার দাঁত পরীক্ষা করিল – সমস্তই ঠিক আছে। চক্ষু পরীক্ষা করিল – কোনো দোষ নাই। কর্ণ পরীক্ষা করিয়া দেখিল শ্রবণশক্তি ঠিক আছে। হস্ত উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল – অশক্ত নহে। হাঁটাইয়া দেখিল – পা ঠিক আছে। তখন জিজ্ঞাসা করিল – 'বাশিষ্টদেব, আপনার দাসী তো বৃদ্ধা, তবে আমার কাজও কম, এখন বলুন দাম কত?'

বাশিষ্ট – 'গৌতমদেব, আপনি ভুল বলিতেছেন। দাসী তো এখন মাত্র বিশ বৎসরের যুবতী। আপনি কি দেখেন নাই যে ইহার হাত-পা কীরূপ মজবুত ও সুন্দর। দশ বৎসরে ইহার দশটি পুত্র হইবে। দ্বিগুণ দাম তো একটি পুত্র দ্বারাই পাওয়া যাইবে। আমি আপনার সহিত দামদস্তুর করিতে চাহি না। আমি পঞ্চাশ টাকা পাইতেছিলাম। যাহা হউক আপনি যখন পরিচিত, আপনাকে দশ টাকা কমেই দিব।'

গৌতম – 'আপনি তো অত্যন্ত বেশি দাম চাহিতেছেন। চুলে কলপ দিয়া আর মাস দুয়েক ভাল করিয়া খাওয়াইবার ফলে মনে করিবেন না যে আমি বুঝি না যে এ পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা। আমাকে অল্প দামের সওদা কিনিতে হইবে। যদি আপনি ঠিক করিয়া বলেন তো ইহাকেই কিনিব।'

বাশিষ্ট – 'আপনি কি আমাকে মেলার অন্যপাঁচজনের মত মনে করিয়াছেন? ইহার ভগিনীকে আমি অযোধ্যার মহারাজ রামচন্দ্রের জন্য একশত টাকায় বিক্রয়

করিয়াছি। আজকাল মহারাজ যজ্ঞ করিতেছেন, দক্ষিণাস্বরূপ তিনি প্রত্যেক ঋষিকে একটি সুন্দরী তরুণী দাসী দিতে চাহেন। দেখিতে পাইতেছেন না এই বৎসর দাসীর মূল্য অত্যন্ত চড়া। আচ্ছা যান, ত্রিশ টাকাই দিন। আমাকেও শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। এ-দাসী যেমন তেমন নহে, এ ভাল নাচ ও গান জানে। কালী একটা গান শুনাইয়া দাও তো।'

কালী একটা গান গাহিয়া শুনাইল এবং নাচেরও দু'একটি ভঙ্গিমা দেখাইল। শেষ পর্যন্ত পনের টাকায় সওদা বিক্রি হইল।

লোকজনেরা নিজের নিজের দাসদিগকে গৃহে লইয়া যাইতেছিল। বিক্রয়ের ফলে কত দাসীর শিশুসন্তানকে শত ক্রোশ দূরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কত-জনের প্রিয়জনের সহিত সারাজীবনের মত বিচ্ছেদ ঘটিল। সন্তান ও প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদের ফলে কোনো কাজে তাহাদের মন বসিতেছিল না। এদিকে নূতন মালিক তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইবার জন্য ব্যগ্র। দু-চারদিন যে-ভাল ব্যবহার দেখা গিয়াছিল এখন তাহা শেষ করিয়া সামান্য অভিযোগেই তাহাদিগকে চাবুক মারা হইতেছিল। তাহাদের প্রাণে হত্যা করিলেও মালিকের কোনো কঠিন শাস্তির আশঙ্কা ছিল না। মালিক তাহাদের সম্বন্ধে ততটাই চিন্তা করিত যতটা সে তাহার পালিত পশুদের জন্য করিয়া থাকে।

ইহাই রামরাজ্যের একভাগ মানুষের জীবন। ইহাই রামরাজ্যে মানুষের মূল্য। ইহারই জন্য কি আমরা গর্ব অনুভব করি? যে-ঋষিদিগের আশ্রমের আশেপাশে মানুষ এইভাবে দাস হইয়া থাকে তাহাদের দয়া এবং সহৃদয়তার গুণগান করিতে আমরা কখনো ক্লান্ত হই না। যে-ঋষিগণের স্বর্গ, বেদান্ত এবং ব্রহ্মের উপর বিরাট বিরাট ভাষণ দিবার ও সৎসঙ্গ করিবার মত অবসর ছিল, যাহারা দান এবং যজ্ঞের উপর বড় বড় পুঁথি লিখিতে পারিত—কারণ ইহাতে তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের লাভ হইত—তাহারা মানুষের উপর পশুর ন্যায় এই অত্যাচারকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য কোনোপ্রকার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই। ঐ সকল ঋষিগণ অপেক্ষা আধুনিক কালের সাধারণ মানুষও অধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন।

শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গবিশেষ। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কতদূর পর্যন্ত সমগ্র সমাজের কথা চিন্তা করিয়াছি এবং প্রাচীনকালেও সাধারণ জনগণ ইহার দ্বারা কত-খানি লাভবান হইয়াছে? সহস্র শতাব্দী ধরিয়া সংগীতকে নৃপতি এবং বিত্তশালী-

দিগের কামভাব উদ্রিক্ত করিবার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সংগীতের প্রতি রুচি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সভ্যতার সর্বনিম্নের জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকর্ষতার সীমায় পৌছিয়াছে এরূপ সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য-প্রীতি দেখা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের দেশই নিজেকে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মনে করিতে চাহে। কিন্তু সে এই দুইটি ললিতকলাকে এরূপ নিম্নে স্থান দিয়াছে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। ইংলণ্ড আমেরিকা এবং জাপানের সুশিক্ষিত পরিবার সংগীত এবং নৃত্যকলাকে নিজের সভ্যতার এক অংশ বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ইহার চর্চা আমাদের দেশে বাইজীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে সংগীত এবং নৃত্যকলা সম্ভ্রান্তবংশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করা হয়।

আমরা মার্জিত, আমরা সভ্য—এই বলিয়া নিজের ঢাক নিজে পিটাইলেই দুনিয়া আমাদের সভ্য বলিয়া স্বীকার করিবে না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র যেরূপ কলুষিত ও প্রতারণাপূর্ণ—এরূপ জাতি পৃথিবীতে আর নাই। এখনো পর্যন্ত আমরা মানুষের মত বাস করিতে শিখি নাই। চতুষ্পার্শ্বের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে অবহেলায় তো আমরা পশুদেরও অধম। ভারতবর্ষের গ্রামের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত গ্রাম তো পৃথিবীর অন্যত্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদের গ্রামের বাহাদুরী এই যে এক অন্ধও এক মাইল দূর হইতে আমাদের গ্রামকে চিনিতে সক্ষম। কারণ শৌচাগারের দুর্গন্ধে তাহার দমবন্ধ হইবার উপক্রম হয়। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান পরিচ্ছন্নতার জন্য নিজেকে অতুলনীয় মনে করিলেও শৌচাগারের কোনো ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। গ্রামের পাশের ক্ষেত তো ইহার জন্যই। কোনো বিদেশী যদি একবার ভারতবর্ষের গ্রামে ঘুরিয়া যায় এবং পাশের ক্ষেতে পৃথক পৃথক ভাবে বিক্ষিপ্ত মলকে হাওয়া বা রৌদ্রে শুকাইতে দেখে তাহা হইলে সে কী করিয়া মনে করিবে যে ভারতবর্ষে মানুষ বাস করে? একবার আমার একজন জাপানী সুহৃদ—যাঁহার নিকট আমার কয়েকদিন সৌহার্দ্যপূর্ণ আতিথ্যলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল—আমাকে ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। তিনি একথাও লেখেন যে ভারতের গ্রামের জীবনকে নিকট হইতে দেখিতে চান। পত্র পাইয়া আমার দুশ্চিন্তা হইল কোন কোন গ্রামে আমার বন্ধুকে লইয়া যাইতে পারি।

সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইল স্নান ও শৌচাগারের ব্যবস্থা লইয়া। ভারতবর্ষের গ্রামে প্রকাশ্য ক্ষেত ছাড়া শৌচাগারের কোনো বন্দোবস্তই নাই। গ্রামের কথা কেন —শহরেও পঞ্চাশহাজার টাকা খরচ করিয়া যিনি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছেন তিনি পঞ্চাশ টাকা ব্যয়ে সেফ্‌টি ট্যাংক বসানোকে অর্থের অপচয় মনে করেন। স্নানের ঘর তো ইংরাজ এবং খৃস্টানদিগের জন্য। আমার দুশ্চিন্তা দেখিয়া আমার এক বন্ধু তাহার বাসস্থলে বিশেষ করিয়া শৌচাগার ও স্নানের ঘর নির্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, আমার জাপানী বন্ধু যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্র পাইয়া আমি কয়েকমাস যে-দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছিলাম তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে আমাদের দৌড় কতদূর। আমার বিস্ময়বোধ হয় যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পরিচ্ছন্নতার পক্ষে অপরিহার্য এই বিষয়ের দিকে কেন নজর দেন নাই। বরং যেটুকু চিন্তা করিয়াছেন তাহাও এরূপ উলটা যে তাহাতে পরিচ্ছন্নতা আরো বাধাপ্রাপ্ত হয়। মল যাহারা পরিষ্কার করে আমাদের সমাজে তাহাদের স্থান সর্বনিম্নে মনে করা হয়। এই জাতিগুলিকে আমরা এখন আর্থিক দুর্গতি দ্বারা পিষ্ট করিতেছি এবং জীবিকার তাড়নায় উহারা নিজেদের মান-মর্যাদাবোধ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। কিন্তু কোনো একদিন এই বোধ জাগ্রত হইবেই। তখন সমাজের সর্বাধিক সেবার বিনিময়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন লাঞ্ছনা তাহারা কেন সহ্য করিবে? আর তাহারা যদি মলমূত্র পরিষ্কার করা বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই কি আমাদের মহল শূন্য হইয়া যাইবে না? ইংলণ্ডে যান, দেখিবেন সেখানে যে-ব্যক্তি রান্না করিতেছে, সে-ই শৌচাগার পরিষ্কার করিতেছে। জাপানে গিয়া দেখুন—সেখানে মলমূত্র বিক্রয়কারী কীরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। কাহারো মল পরিষ্কার করিতে ঘৃণা নাই। আমাদের পৃথিবীই বিচিত্র!

প্রত্যেকটি উপযোগী নূতন বস্তু গ্রহণ করিবার প্রশ্নে আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দোহাই দিই। হ্যাট কোট প্যাণ্ট দেখিয়া আমাদের অনেকেই ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করেন। আর্থিক ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিবার প্রশ্ন উঠিলে আমাদের কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু কাজ করিবার পক্ষে ঢিলাঢালা ধুতি বা লম্বা চওড়া শালওয়ার কি উপযুক্ত পোশাক? ফতুয়া, হাফ-প্যাণ্ট ও সোলার টুপি কাজ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পোশাক। রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইতে সোলার

টুপি অত্যন্ত কাজের। এই পোশাকগুলিকে পাশ্চাত্ত্য, ইউরোপীয় অথবা খৃস্টান-দের বলিয়া আমরা অবজ্ঞা করি। কিন্তু আমরা এ-সম্বন্ধেও অজ্ঞ যে এগুলি পাশ্চাত্ত্য, ইউরোপীয় অথবা খৃস্টান সভ্যতার নিদর্শন নহে। দুইশত বৎসর পূর্বেও ইংরাজের পূর্বপুরুষ মাথায় ঝাঁকড়া চুল রাখিত। তাহাদের পোশাকও এলো-মেলো ছিল। আধুনিক পোশাক বিগত দুইশত বর্ষের চিন্তা এবং পরিবর্তনের পরিণাম। এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেও ইউরোপীয় স্ত্রী দীর্ঘ কেশ রাখিত। তাহাদের পোশাকের জন্য এখন হইতে অনেকগুণ বেশি কাপড়ের প্রয়োজন হইত। কোমর অস্বাভাবিক রূপে বাঁধিয়া সরু করা হইত। আজ ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা চুল কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের পোশাকও হালকা হইয়াছে, কোমর সরু করিবার তাহাদের সেই পুরাতন ঝোঁকও এখন আর নাই।

স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ কেন হয়? সন্তানলাভই সেখানে প্রধান উদ্দেশ্য নহে। প্রথমে তো আমাদের এখানে বিবাহ দিবার ভার মাতাপিতা জোর করিয়া নিজেরা লইতে চাহেন। সন্তান যাহাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে সেজন্যে বাল্যকালেই বিবাহ দিতে চাহেন। ইহাও আমাদের সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ যে সমগ্র জীবন যাহাদের একত্রে কাটাইতে হইবে তাহাদিগকে পরস্পরের প্রকৃতি এবং রুচি জানিবার সুযোগ না দিয়া চিরকালের মত পরস্পরের গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ লক্ষ পারিবারিক জীবনকে নরকে পরিণত করিয়াছে। তবুও কেহ ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। মাতাপিতা বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহিত দম্পতির জন্য আমাদের কঠিন আদেশ—অন্ততপক্ষে যৌবনকালে তাহারা যেন একে অন্যের সহিত প্রকাশ্যে মেলামেশা না করে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পৃথক শয্যা নাই। সেখানে শয্যা পৃথক হইবার অর্থই হইতেছে বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তুতি। কিন্তু আমাদের দেশে শয্যাই কেবল পৃথক নহে, শয়নকক্ষও পৃথক এবং শিষ্টাচার হইতেছে পতি যেন গৃহের অধিবাসীদের জ্ঞাতসারে পত্নীর নিকট না যায়। বিবাহিত পুরুষ নিজের স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখিতে পারে না। চাকুরি কি ব্যবসায় উপলক্ষে যদি বর্ষাধিক কালও দূরে থাকিতে হয় তাহা হইলেও স্ত্রী লইয়া থাকিবার স্বাধীনতা শিষ্টাচার বহির্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। মূলকথা এই যে, যে-ইতিহাস ও সংস্কৃতি লইয়া অহংকার করি, তাহা আমাদিগকে এক সাধারণ

মানুষের ন্যায় জীবন কাটাইতে দিতে চাহে না। আহারবিহার চালচলন বিবাহ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং ভ্রাতৃত্ব সকল বিষয়েই সে আমাদের দুনিয়ার দৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিতে চাহে। আমাদের পক্ষে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট হইবে যে এই ইতিহাসকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলা ও এই সংস্কৃতি হইতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট হইতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করা।

জাতিভেদ

আমাদের দেশ যেসব বিষয় লইয়া গর্ববোধ করে তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ অন্যতম। অন্যান্য দেশে জাতিভেদের অর্থ—ভাষার পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য। আমাদের দেশে একই ভাষাভাষী একই বর্ণবিশিষ্ট লোক ভিন্ন ভিন্ন জাতির হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত জাতিভেদ ভারতের বাহিরে অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। এই ভারতীয় জাতিভেদের উদ্দেশ্য কী ? ধর্ম এবং আচারপালনে যাহারা গুরুত্ব আরোপ করে তাহারা ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে আহার করিতে পারিবে না, তাহাদের হাতের ছোঁয়া জলও পান করিতে পারিবে না ; বিবাহ তো বহুদূরের প্রশ্ন। মুসলমান এবং খৃস্টানও এই ছোঁয়াছুঁয়ির রোগ হইতে বাঁচিতে পারে নাই, অন্তত বিবাহ-ব্যাপারে। জাতিভেদেরই উগ্র রূপ অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশের এক ভয়াবহ সমস্যা। অনেকের গায়ে ছোঁয়া লাগিলে স্নান করা প্রয়োজন মনে করে। অনেক স্থলে অস্পৃশ্যদের পথ দিয়া যাইবার অধিকার নাই। হিন্দুদের ধর্মপুস্তকগুলি এই অন্যায়ের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক কারণ হাজির করে। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু একই সাথে শাস্ত্র এবং বেদের দোহাই লইয়া চলিতে চাহিতেন। ইহা তো কর্দমের সাহায্যে কর্দম পরিষ্কার করা।

অন্যান্য দেশের লোকজনের পক্ষে অস্পৃশ্যতা কী বুঝিতে পারা কতটা কঠিন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। ১৯৩২ সনে বৃটিশ সরকার যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেয় আর গান্ধীজী তাহার জন্য আমরণ অনশন আরম্ভ করেন তখন আমি লণ্ডনে ছিলাম। অনেকদিন পরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই রোমহর্ষক সংবাদ বিলাতের পত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়। তাহারা বড় বড় অক্ষরে ইহা ছাপে। যে-সকল দেশে অস্পৃশ্যতা নাই তথাকার অধিবাসীরা ঐ সম্বন্ধে কী জানিবে ? লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একটি চৈনিক ছাত্র আমার নিকট আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে অস্পৃশ্যতা কী ? আমি তাহাকে খানিকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল ইহা কি কোনো ছোঁয়াচে অসুখ অথবা কুষ্ঠের ন্যায় কোনো ব্যাধি যাহাতে লোকে রোগগ্রস্তকে স্পর্শ করিতে চাহে না ? আমি বলিলাম সে

আমারই মত সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান। হ্যাঁ, অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা হীন। আমি আধ ঘণ্টারও অধিককাল তাহাকে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুঝিলাম যে আমার বন্ধুটি কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তখন আমি আমেরিকার নিগ্রোদের উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলাম। এবার আমি খানিকটা বুঝাইতে সক্ষম হইলেও সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে একই বর্ণ এবং চেহারার মধ্যে অস্পৃশ্যতা কী করিয়া থাকিতে পারে?

বিগত হাজার বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে ভারতবাসীর বিদেশীর দ্বারা পদদলিত হইবার প্রধান কারণ জাতিভেদ। জাতিভেদ কেবল মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেই বিভক্ত করে না—একই সাথে সকলের মনে উচ্চ-নীচের মনোভাব সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ মনে করে আমি শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হীন। ক্ষত্রিয় মনে করে আমি উচ্চ আর কাহার নীচ। কাহার মনে করে আমি উচ্চ, চামার নীচ। চামার মনে করে আমি উচ্চ, মেথর নীচ। মেথরও নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কাহাকেও সম্ভবতঃ নীচ মনে করিয়া থাকিবে! ভারতবর্ষে হাজার হাজার জাতি এবং সকলের মধ্যেই এই মনোভাব। ক্ষত্রিয় হইলেই মনে করিবেন না যে তাহারা সকলেই সমান। তাহাদের মধ্যে অসংখ্য জাতিভেদ আছে। তাহারা কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া নিজেকে উচ্চ প্রমাণিত করিবার জন্য নিজেদের জাতির মধ্যেই অনেক লড়াই বিবাদ করিয়াছে এবং দেশের সৈনিক-শক্তির বহু অপচয় ঘটাইয়াছে।

এই জাতিভেদের ফলে দেশরক্ষার ভার একটি জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়। যেখানে দেশরক্ষায় সমগ্র দেশের আত্মাহুতির প্রস্তুতি প্রয়োজন সেখানে একটি জাতির স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্ষত্রিয় জাতি সৈনিকবৃত্তিতে আপনাকে অযোগ্য প্রমাণ করে নাই, তথাপি কেবল দেশরক্ষার কথাই নহে। সেখানে সাথে সাথেই রাজশক্তির প্রলোভনও তাহাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে তাহারা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে লড়াই করিতে থাকে। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশেষ বিশেষ রাজবংশকে রক্ষা করা। রাজ-বংশের পরস্পরের মধ্যে রাজশক্তিকে দখল করিবার জন্য রেষারেষি দেশের সৈনিকশক্তিকে অনেক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়াছিল এবং তাহারা একত্রিত হইয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি জাতিভেদ না

থাকিত তাহা হইলে অন্য দেশগুলির মত সমগ্র ভারতবাসীও দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিত। জাতীয় ঐক্যের ফলে বহু ক্ষুদ্র দেশও দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। এই বিশাল ভারত যখন দ্বাদশ শতাব্দীতে পরাধীন হয়, লঙ্কার মত ক্ষুদ্র দ্বীপ—যাহার জনসংখ্যা এখনো পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি—১৮১৪ সন পর্যন্ত পরাধীন হয় নাই। ব্রহ্মদেশ তো তাহার পরেও ষাট বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী এই ক্ষুদ্র দেশগুলি কী করিয়া এতদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? আজও আফগানিস্তানের ন্যায় দেশ কী করিয়া স্বাধীন? এই কারণে যে সেখানে জাতি এত অংশে বিভক্ত নহে। সেখানে উচ্চ-নীচের মনোভাব এরূপভাবে প্রসারিত হয় নাই এবং দেশের সকলেই স্বাধীনতার জন্য ক্ষত্রিয় হইয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কয়েকবার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন অভ্যাসই ইহা সম্ভব হইতে দেয় নাই। শেরশাহ্-বংশের রাজমন্ত্রী বীর হেমচন্দ্র (হেমু) শুধু চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি একবার দিল্লীর সিংহাসনেও আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতেরা বৈশ্য বলিয়া তাহার বিরোধিতা করে। দূরদর্শী সম্রাট আকবর ভারতবর্ষে একটি জাতি স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। তাহার পর হিন্দু মুসলমান কখনো জাতীয় একতাকে সুনজরে দেখিতে চাহিল না। ইংরাজদিগের হস্তে যাইবার পূর্বে ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য মারাঠাদিগের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু তাহাও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের প্রশ্নে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের পরাজয়ের সমগ্র ইতিহাসই বলে যে আমরা জাতিভেদের ফলেই এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছি।

অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া কংগ্রেস জাতীয় ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে-সামান্য ঐক্য স্থাপনে সে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি! দুইটি প্রদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রদেশের শাসনরজ্জু আজ কংগ্রেসের হস্তে। (সিন্ধু প্রদেশের সরকারও কংগ্রেসকে স্বীকার করে।) কিন্তু আমরা কংগ্রেসের নেতাদের কি মনোভাব দেখিতে পাইতেছি? কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যেখানে একদিকে জাতীয় ঐক্যের রবে স্বর্গ-মর্ত মুখরিত করিতেছেন তখনই অপরদিকে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' আর 'হিন্দুধর্মের প্রেমে' তিনি

কাহারো অপেক্ষা সামান্য পিছাইয়া পড়িতে রাজি নহেন। আর এই কারণেই সে জাতিভেদের সংকীর্ণ গণ্ডির সামান্য বাহিরে যাইতেও সাহস পায় না। কায়স্থ কংগ্রেস নেতা কায়স্থ জাতির ঐক্য এবং অগ্রসরতা সম্বন্ধে খুব সচেতন। যখন তাহার জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলই নিজের জাতির মধ্যেই হইবে তখন তাহার পৃথিবী তো কায়স্থদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যোগ্য-অযোগ্যতার বিচার না করিয়া নিজেদের কায়স্থ আত্মীয়স্বজন ও তাহাদের পরিবারের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। যে কোনো চাকুরি দিতেই হইবে। এইরূপ জাতিপ্রীতির জন্য কাজ করিতে গিয়া কোনো অন্যায়ই অন্যায় নয়, কোনো পাপই পাপ নয়। ভূমিহার কংগ্রেস নেতার যখন ভূমিহার জাতির বাহিরে কোনো সম্পর্ক নাই, তখন ভূমিহার জাতির বাহিরের পৃথিবীকে কী করিয়া নিজের বলিয়া মনে করিবে? আমাদের নেতাদের মধ্যে জাতিভেদের এই ধারণা কীরূপ প্রবল তাহা আমরা সকলেই জানি। এই মনোভাবের জন্য আমাদের সর্বজনীন জীবন অত্যন্ত কলুষিত, রাষ্ট্রীয় শক্তিও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। রাজনৈতিক দল তো প্রথম হইতেই ছিল, ইহাতে জাতিভেদ আসিয়া অবস্থাকে আরো ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে। এই জাতিভেদ কেবল হিন্দুদিগের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নহে, উপরন্তু মুসলমান এবং অন্যান্যেরা ইহার কবল হইতে রেহাই পায় নাই। মুসলমানদের উচ্চবর্ণের নেতাদের স্বার্থ এবং অদূরদর্শিতার জন্য সেখানে 'মোমিন' আর 'মোমিন নয়' এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। যদিও মুসলমান নবাব এবং ধনী ব্যবসায়ীরা চিরদিন এই চেষ্টাই করিয়াছে যে খাজনা এবং গো-হত্যার প্রশ্ন তুলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোক-দিগকে পৃথক করিয়া রাখা যায়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই প্রয়াস বিফল হইবে। জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন। তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হইলে তবেই তাহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারি-বেন। কিন্তু তাহাদের এই মনোবৃত্তি নিন্দনীয়। বিহার প্রদেশের কংগ্রেস নেতা এবং মন্ত্রীদের মধ্যে এই জাতিবিচার অত্যন্ত ঘৃণিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মন্ত্রীরা স্বজাতীয় সদস্যদের নিজের আওতায় রাখিয়া সেই দৃষ্টি দ্বারাই কাজ করেন। অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন না আসে তাহা হইলে সর্বজনীন জীবনের নোংরামি চরম সীমায় পৌছিবে।

যাহারা ধনী অথবা ধনী হইতে আগ্রহশীল, তাহারাই এই সকল নোংরামী

ছড়াইয়াছে। সকলেরই চিন্তা অর্থসঞ্চয় অথবা উহার রক্ষণাবেক্ষণ। দরিদ্র এবং আপন শ্রমলব্ধ অর্থে যাহারা জীবন যাপন করে তাহাদের ক্ষতিই সর্বাধিক। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জাতিভেদের প্রতি জনসাধারণের মধ্যে যে-ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদিগকে নিজেদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেয় না। ইহাতে স্বার্থান্ধ নেতারাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক।

দুনিয়ার হালচাল আমাদের ইহাই বলে যে আমরা এই জাতীয় অনৈক্যকে অধিক দিন জিয়াইয়া রাখিতে পারিব না। সারা পৃথিবীর গতি লক্ষ্য করিয়া আজ ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য আর অস্পৃশ্য থাকিতে রাজি নহে। নিম্নজাতি আর নিম্নজাতি থাকিতে চাহে না। অস্পৃশ্য ও নিম্নজাতি রাখিয়া কেবল তাহাদের সহিত অসম্মান-সূচক ব্যবহারই করা হয় নাই—উপরন্তু আর্থিক স্বাতন্ত্র্য হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা কেন হাজার হাজার বৎসর পূর্বেকার নির্দিষ্ট স্থলে থাকিতে চাহিবে? স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাগণও এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাহাদের নিকট এই সামাজিক লড়াই রাজনৈতিক লড়াই হইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহারা জানে যে যতদিন পর্যন্ত জাতপাতের ভেদাভেদ শেষ করা না যাইবে তত-দিন জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত করা যাইবে না। তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে এই বিষয়ে ধর্মান্ধতাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। কিন্তু তাহারা ধর্মান্ধতার ধার ধারে না। তাহারা তো জাতিভেদের সহিত হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মান্ধতাকে একইরূপে প্রহার করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে।

দেখিয়া মনে হয় জাতিভেদ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হইবে না কারণ ইহার ভিত্তিমূলে দৃঢ়হস্তে আঘাত করা হইতেছে না। জাতীয় বিভেদের রূপ দুইটি—এক খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি, দ্বিতীয় বিবাহে অসহযোগিতা। খাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি তো সকলের প্রথমে ধনীরাই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এই ধনীরাই নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় ঐক্যের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাদের নিকটে অর্থ ছিল, বিলাতযাত্রার জন্য তাহারাই সর্বপ্রথম প্রস্তুত হন। যেখানে প্রথমে বিলাতে গেলে জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত, আজ বিলাতফেরতরাই জাতির শিরোমণি। কেবল দারভাঙ্গা, বিকানীরই নহে, অন্যজাতির নেতাদেরও

দেখুন। সর্বত্রই আজ বিলাতে সকলরকমের লোকের সহিত সকল রকমের খাদ্য খাইয়া যাহারা ফিরিয়াছে তাহারাই নেতৃপদে আসীন। আই সি এস জামাতা লাভে সমর্থ শ্বশুর নিজেকে ধন্য মনে করে।

গত কুড়ি বৎসরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য খুব দ্রুতগতিতে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২১ সনের পূর্বে হিন্দু হোটেল দেখাই যাইত না। কিন্তু আজ ছোট ছোট শহরগুলিতেই নহে অধিকন্তু ছোট ছোট স্টেশনেও অনেক হোটেল খোলা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কে ভাবিতে পারিত যে ছাপরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরেও হিন্দু মাংস-পরোটা বিক্রয় করিবে? আমার একটি বন্ধু এক-বার পাটনার কোনো একটি হোটেলে ভোজন করিতে যান। একটি ছেলে তাহার পংক্তির পাশেই বসিয়াছিল। আর তাহার পাশে এক মৈথিল ব্রাহ্মণ চন্দন টীকা ইত্যাদি লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। জায়গাটা ছোট ছিল। আর ছেলেটির হাত ব্রাহ্মণের গায়ে লাগিল। তাহাতে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন। ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার জাত কী। আমার বন্ধু ছেলেটিকে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন—'বল, চামার।' ছেলেটি তাহাই বলিলে ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস মুখেই রহিয়া গেল। তিনি কিছু বলিতে গেলে আশেপাশের লোকেরা তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—'এটা হোটেল, এখানে ডাল-ভাত বিক্রয় হয়। তুমি জাতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?' ব্রাহ্মণ দ্বিধায় পড়িলেন। যদি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান তাহা হইলে শুধু পয়সাই নষ্ট হয় না, প্রকাশ্যে সকলের হাসিবার সুযোগও মিলিবে। ফলে বেচারা মাথা নিচু করিয়া চুপচাপ আহার সমাপ্ত করিল।

আহারাদির ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যার প্রায় সমাধান হইয়াছে। শিক্ষিত যুবক এই লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য রাখিতে চাহে না। কিন্তু বিবাহের প্রশ্ন এখনো কঠিন মনে হয়। একদিন ট্রেনে সফর করিবার সময় আমার সহিত এক মুসলমান নেতার দেখা হয়। তিনি সমাজবাদীগণের নামে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেন। বলিলেন—'সমাজবাদীগন জনগণের দারিদ্র্য দূর করিতে চাহে। ইসলামও সাম্যের প্রচারক, তবে তাহারা ধর্মবিরোধী কেন?'

আমি—'সাম্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে কণামাত্র শক্তিরও অপচয় করিতে চাহে না। তাহারা চাহে যে পৃথিবীতে সামাজিক অন্যায় আর দারিদ্র্য না থাকে।'

মৌলানা–'এই ব্যাপারে আমি আপনার সহিত একমত।'

আমি–'আপনিও আমাকে সাহায্য করিবেন। আপনি কি সারা ভারতকে আহার ও বিবাহব্যাপারে এক করিতে রাজি আছেন?'

মৌলানা–'তাহার কী প্রয়োজন?'

আমি–'কারণ যতদিন দরিদ্রেরা একত্রিত হইয়া শোষকগণকে–তাহারা বিদেশীই হউক অথবা স্বদেশীয়–পরাজিত করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। নিজের শ্রমলব্ধ অর্থে নিজের ভোগের অধিকার অর্জন করিতে পারিবে না।'

মৌলানা–'আহারের প্রশ্নে আমি একমত, কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে নহে।'

পাশেই এক পণ্ডিতমহাশয় বসিয়াছিলেন। কথাবার্তায় তাহাকে উকিল বলিয়া মনে হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন–'আপনারা তো অন্য দেশের ছাঁচে ভারতবর্ষকে গড়িতে চান। আপনারা এতটুকু চিন্তা করিবার কষ্ট স্বীকার করেন না যে ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। ইহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুলনাবিহীন। ভারতবর্ষ ইউরোপ হইতে পারে না। যাহা হউক খাওয়ার প্রশ্নে তো ভারত এক হইতে চলিয়াছে, কিন্তু বিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া তো আপনি মূর্খতার একশেষ করিতেছেন।'

আমি–'কিছুদিন পূর্বে আহারসম্বন্ধীয় একতাও নির্বুদ্ধিতার কথাই ছিল। যাহা হউক, আপনারা তো আজ উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিবাহের প্রশ্নও নির্বুদ্ধিতার কথা নয়। কুড়ি বছর পূর্বেও আলাদা আলাদা উনান দেখিয়া কে আশা করিতে পারিত যে আজিকার পরিবর্তন দেখিবার সুযোগ হইবে? হিন্দু প্রকাশ্যভাবে মুসলমান এবং খৃস্টানের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সাধ্য কি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে? হিন্দু-মুসলমান বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের ভ্রাতুষ্পুত্রী মুসলমান বিবাহ করিয়াছেন। আসফ আলির স্ত্রী অরুণা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রফেসর হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশে এই ধরনের বিবাহই করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে যেখানে হিন্দু যুবতী ধর্ম পরিবর্তন না করিয়া বিবাহ করিয়াছে। হিন্দু যুবকও ধর্মের নিগড় ভাঙ্গিয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গুজরাতের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দু যুবক এক প্রতিষ্ঠাবান মুসলমানের সুশিক্ষিতা কন্যাকে

বিবাহ করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সমাজের শক্ত বাঁধের ভিতর যেখানে ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দেখা দিয়াছে সেখানে তাহাকে টিকাইয়া রাখা কঠিন হইবে।

'জাতিভেদ দূর করিলে একই ধর্মের মধ্যে বিবাহসংখ্যা আরো অধিক হয়। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে যে-কাজ করিতেই হইবে তাহাও লোকে অত্যন্ত মন্থরগতিতে করিতে চাহে। সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যস্থাপন আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন এবং ধর্মান্ধতা ও জাতিভেদকে কবরস্থ করিতে পারিলেই উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে যাহা অবশ্যম্ভাবী ও যাহা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই তাহা সম্পন্ন করিতে এরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন কি চরম মূর্খতা নহে ?'

ভারতবাসী এক জাতি। সকল ভারতবাসী—সে হিন্দু হোক অথবা মুসলমান, বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী অথবা খৃস্টান, আস্তিক অথবা নাস্তিক—সকলে একই জাতি—ভারতীয়। ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই নহে, প্রতিবেশী ইরান এবং আফগানিস্তানেও আমাদের হিন্দী (ভারতীয়) নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। হিন্দুসভার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নিজেদের মধ্যে জাতিভেদকে দূর করিতে যতই উৎসাহ দেখাক, তাহারা সময়-অসময়ে একথাও ঘোষণা করে যে হিন্দু এক পৃথক জাতি। মুসলমানেরা তো পণ করিয়াছে যে তাহাদের চিরদিনের জন্য একটি পৃথক জাতি করা হউক। তাহারা সেই ধারণা অনুসারেই ভারতবর্ষকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করিতে চায়। নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে সাত কোটির শরীরে সেই একই রক্ত যাহা হিন্দুর শরীরেও প্রবাহিত হইতেছে। অবশিষ্ট দুই কোটির মধ্যে কতজন আছেন যিনি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে তাহার এক-চতুর্থাংশ রক্ত ভারতবর্ষের বাহিরের কোনো জাতির। রক্তের দ্বারা কি জাতি নির্ণয় হয় ? আর এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে পৃথিবীর কোনো লোকই ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষের মুসলমানকে অন্যজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে না। ভাষার মধ্যে জোর করিয়া কিছু আরবী শব্দ ঢুকাইয়া কেহ নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারে না। তিন-চতুর্থাংশ আরবী শব্দ বলিয়াও ভারতবর্ষের মুসলমান আরবে গিয়ে ভারতীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বলিতে পারিবে না কিংবা আরবীকে মাতৃভাষা করিতে পারিবে না। আমাদের যুবকেরা এই ভেদনীতি

অধিকদিন সহ্য করিবে না। নবাগত সন্তানদের জন্য তো ইহাই ঠিক হইবে যে হিন্দু সন্তানের জন্য মুসলমানী এবং মুসলমান সন্তানের জন্য হিন্দু নামকরণ করা। এই সাথে ধর্মান্ধতাকেও প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে হইবে। আকার প্রকারের কৃত্রিম বিভেদেরও অন্ত ঘটানো হউক। এইভাবেই ধর্মান্ধদের আমরা সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি।

ইহা নিশ্চিত যে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়াই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করা যাইতে পারে।

শোষক শ্রেণী

জোঁক নিজের জীবিকার জন্য কোনো পরিশ্রম না করিয়া অন্যের শোণিতে জীবন নির্বাহ করে। মনুষ্যরূপী জোঁকেরা এই জোঁক হইতে অধিক ভয়াবহ। তাহারা মানুষের জীবনকে কীরূপ হীন এবং সংকটপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি এবং পরেও কিছু বলিব। এই জোঁকেদের উৎপত্তি কী করিয়া হইল? আদিম অসভ্য মানুষ জঙ্গলে বাস করিত। কিন্তু নিজের জীবন ধারণের উপায় সে ধরিত্রীমাতার নিকটে অন্বেষণ করিত। সে শিকার করিত, জঙ্গলের ফল পাড়িত, কিন্তু অন্যের উপার্জনে অন্যের শোণিত-পানে জীবন কাটাইতে চাহিত না। আত্মরক্ষার জন্য সে নেতাও নির্বাচন করিত, সমাজও সংগঠিত করিত, কিন্তু শোষণকারীর সেখানে স্থান ছিল না। শিকারীর জীবন হইতে সে পশুপালকের জীবনে উন্নীত হইল। তখনো তাহাদের শাসক ও প্রধান স্বয়ং পশুপালন করিত। তবে এই সময় হইতে কখনো কখনো একটি দুইটি গরু ভেড়া সে উপঢৌকন হিসাবে পাইতে লাগিল এবং এইরূপে খুব সামান্যভাবে মানুষ-জোঁকের উৎপত্তি হইল। কৃষিকাজ করিবার অবস্থায় পৌঁছিলে নেতা এবং শাসকের প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। সে তখন রাজা হইয়া বসিল। যদিও প্রথমে সমাজের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং শাসনের সুব্যবস্থার ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং যতদিন সেই কাজ সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিত তাহার পদ ততদিনই সুরক্ষিত ছিল। যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত রাজা ক্রমে উপঢৌকন এবং কর হিসাবে অধিক ধন একত্রিত করিতে সক্ষম হয় এবং এই প্রকারে যোগ্যতার অতিরিক্ত ধনের শক্তিও তাহার করায়ত্ত হয়। প্রথমে যেখানে সে শাসক ও নেতা হিসাবে লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিত এখন ধনের প্রলোভন দেখাইয়াও কিছু লোককে নিজের দিকে টানিতে লাগিল। এই-রূপে সে যথেচ্ছাচার করিবার সাহস পাইল এবং সাথে সাথে এই চেষ্টাও করিতে আরম্ভ করিল যাহাতে তাহার পদ তাহার পুত্র পাইতে পারে। বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফলে যোগ্যতার কদর আর রহিল না। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইতে

আরম্ভ করিল। রাজ-পরিবারে সমস্ত ব্যয় অপরের উপর চাপান হইল।

এই জোঁকেরা নিজের জীবিকাই শুধু অন্যের উপার্জনের উপর চাপাইল না, জমি হইতে যাহারা ফসল উৎপাদন করে তাহাদের অনেককে ভৃত্য, প্রচারক ইত্যাদি রূপে নিযুক্ত করিয়া সমাজকে তাহাদের শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করিল। পুরুষানুক্রমিক রাজা ততদিনই এই ধরনের শোষণ, আলস্য ও কামনা তৃপ্তির জন্য নানা প্রকারের নোংরামী বিস্তার করিয়া চলিত, যতদিন না জনতাকে উত্যক্ত দেখিয়া অন্য কোনো সেনাপতি বা মন্ত্রী রাজাকে হত্যা করিয়া নূতন রাজবংশের ভিত্তিস্থাপন না করিত। যখন হইতে রাজা অধিক সম্পত্তির মালিক এবং দায়িত্ব-হীন শাসক হইয়া উঠিল তখন হইতে বহু লোক 'যেমন রাজা তেমনি প্রজা' এই নীতি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং শোষক হইয়া আরামে ও সুখেশান্তিতে জীবন কাটাইতে লাগিল। ইহার জন্য রাজাও তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া প্রলোভিত করিত। ধরিত্রী হইতে যাহারা ধন উৎপাদন করে তাহাদের স্থান অনেক নিচে রহিয়া গিয়াছিল। আর রাজা, রাজপুত্র, পুরোহিত, মন্ত্রী, সামন্তই শুধু নহে তাহাদের সেবকদেরকেও ধনোৎপাদনকারীদের অপেক্ষা অধিক সম্মানিত মনে করা হইতে লাগিল। কায়িক শ্রমকে অত্যন্ত হীন দৃষ্টিতে দেখা হইতে লাগিল। এখন শোষকদিগের আর একটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল যাহারা কারিগর ও কৃষকদিগের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়বিক্রয় করিত। এই সাধারণ ব্যবসায়ীরা মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্যবসাকে আরো বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। ইহাদের বড় বড় ক্যারাভান দেশের এক অংশের পণ্য অন্য অংশে পৌঁছাইয়া দিয়া লাভ করিত। রাজা রাজপুত্রের পরে প্রাধান্য ছিল সেই সকল মন্ত্রী ও সেনাপতিদের যাহারা তাহাদের রাজভক্তির জন্য বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের পরে স্থান ছিল ব্যবসায়ীর। সমাজের তখনো কিছু কিছু পুরাতন ধারণা উঁকি-ঝুঁকি মারিত। কারণ কৃষকের উপার্জনকে অন্য সকল হইতে শুভ মনে করা হইত। রাজকর্মচারীর বৃত্তি অথবা বাণিজ্যকে নিম্নশ্রেণীর জীবিকা মনে করা হইত। কিন্তু পৃথিবীর সুখসম্পদ তো তাহাদের জন্যই যাহাদের নিকটে ধন আছে —সে-ধন যেভাবেই উপার্জিত হইয়া থাকুক না কেন। রাজকার্য এবং ব্যবসায়ের তো কথাই নাই, আধুনিক কাল পর্যন্ত পাপলব্ধ ধন বলিয়া গণ্য করা হইত সেই সুদ হইতে লাভকেও কেহ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না। সামন্তদাস এবং অর্ধদাস

দিয়া জমি চাষ করাইত এবং অগণিত কৃষকের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকে জিনিস তৈয়ারি করাইত। ব্যবসায়ী কেবলমাত্র স্থল ও জলপথে ব্যবসা করিত না—কখনো কখনো কিছু কারিগরদের একত্র করিয়া তাহাদের দ্বারা বাণিজ্যের বহু পণ্য প্রস্তুত করাইয়া লইত। বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত আয়ই এখন সর্বাধিক সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। আর হইবেই বা না কেন—যখন স্বয়ং পুরোহিত-শ্রেণীই এই লুণ্ঠনের লাভে ফুর্তি করিতেছিলেন! তাহাদের হাতেই তো ভাল-মন্দ বিচারের ভার ছিল।

ক্রমশ যখন অবস্থা এই সীমায় আসিয়া পৌঁছিল যে মনে করা হইতে লাগিল রাজা আপনার পূর্ব তপস্যার ফল ভোগ করিতে অথবা ভগবানের আশীর্বাদে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন খুব বেশি হইলে রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কিছু যোগ্যতার পরিচয় দিত এবং তাহার উত্তরাধিকারীরা যোগ্য অথবা অযোগ্য যাহাই হউক কেবলমাত্র ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিবার জন্যই সিংহাসনে আরোহণ করিত। বিনা আয়াসে লব্ধ এই ভোগবিলাসকে দেখিয়া কে না প্রলুব্ধ হইবে? আর ইহার জন্য নৃপতিরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ শুরু করিলে যোগ্য সেনাপতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইল এবং অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে রাজা সামন্তদের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন।

শিকার এবং কৃষিকাজের সহিত প্রথম শোষকের উদ্ভব। রাজতন্ত্রের যুগে তাহাদের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায় এবং রাজপুত্র রাজকর্মচারী ব্যবসায়ী তথা তাহাদের পরিবারেরা শোষক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিল।

সামন্তদিগের হাতের পুতুলে পরিণত হইয়া রাজা তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। এইরূপে সামন্ততন্ত্রের যুগে শোষকের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়া গেল। এই যুগ সমাপ্ত হইবার সময় ইউরোপে ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করিবার নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'—এই প্রচলিত প্রবাদবাক্য প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীও পর্তুগাল স্পেন ইত্যাদি দেশের ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি পৃথিবীর দূর দূর দেশে বাণিজ্য করিতে শুরু করিল। ইংলণ্ডে তাহার নিকট অগাধ সম্পত্তি সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িতে লাগিল। তথাপি পৃথিবীর অনেক ভাগই বাকি ছিল এবং সকল সাহসী

ব্যক্তিদিগেরই কোনো না কোনো জায়গায় কাজ জুটিয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইংরাজেরা প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাজার তাহাদের দখলে ছিল। তাহাদের মালপত্রে ভরা জাহাজ ইংলণ্ড হইতে বাজারে এবং বাজার হইতে ইংলণ্ডে ছ'মাসে পৌঁছিত। সেসময় পালতোলা কাঠের জাহাজে যাওয়া খুব বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু প্রভূত লাভের নিকটে বিপদ তুচ্ছ! ব্যবসায়ীদের প্রধান চিন্তা ছিল কী করিয়া অধিক মাল উৎপন্ন করা যায়। এই সময় ইংলণ্ডে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়। বাষ্প দ্বারা চালিত যন্ত্র দ্রুত ও অধিক পরিমাণে মাল উৎপাদন করিতে লাগিল। ইঞ্জিনকে রেল ও জাহাজের সহিত জুড়িয়া দেওয়ায় দীর্ঘ যাত্রাও সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল এবং বিপদ ও পরনির্ভরতা হ্রাস পাইল

যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে হস্ত-নির্মিত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্র-নির্মিত দ্রব্যের অপেক্ষা অধিক পড়িতে লাগিল এবং যেসকল কারিগর হাতে কাজ করিত তাহারা বেকার হইল এবং তাহার ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকে কলকারখানা বিনষ্ট করিল, স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইল। কিন্তু এখন ব্যবসায়ীদের শক্তি আর সামান্য ছিল না। অর্থের দৌলতে রাজদরবারে তাহাদের প্রতিপত্তি এবং সম্মান সামন্তদিগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অর্থের সাহায্যে তাহারা শাসনদণ্ডের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। যন্ত্রচালিত কারখানার মালিক বা পুঁজিপতির পশ্চাতে ছিল রাজশক্তি। কারিগরেরা তাহাদের সহিত কী করিয়া আঁটিয়া উঠিবে? ধীরে ধীরে তাহাদের দাঙ্গা থামিয়া গেল। দমন ছাড়াও ইহার অন্য কারণ ছিল। যন্ত্রচালিত কারখানা প্রধানত ইংলণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের নিকটে সমগ্র পৃথিবীর বাজার খোলা পড়িয়া ছিল। এই প্রকারে সেখানকার পুঁজিপতি সমস্ত কারিগরদিগকেই বেকার না করিয়া তাহাদিগকে নূতন নূতন কারখানায় নিযুক্ত করিত। ব্যবসায়ে উন্নতির সাথে সাথে পুঁজিপতিদের নিকট অগাধ ধনসম্পদ জমা হইতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডের রাজশাসনও পুঁজিপতিদের হাতে চলিয়া গেল আর রাজতন্ত্র অথবা সামন্ততন্ত্রের স্থলে পুঁজিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ। East India

এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বে নানাপ্রকারের ওলটপালট হইতে লাগিল। দেশের শ্রমিক পুঁজিপতিদের অর্থে ক্রীতদাসে পরিণত হইতে লাগিল।

যেসকল দেশে পুঁজিপতিদের শাসন বজায় ছিল সেখানেও সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে সামন্ততন্ত্রের স্থান ধনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তখনো সামন্ততন্ত্রই চলিতেছিল। তথাপি বৃটিশ ধনতন্ত্র নিজেদের দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রকে লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

ইহার পরিণাম হইল যে যদিও সমগ্র ভারতে বৃটিশ ধনতন্ত্রের শোষণ কায়েম করা হইয়াছিল, তথাপি দেশীয় রাজ্য ও বড় বড় জমিদারির মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রকে নানা রূপে বজায় রাখা হইল। একথা তো এখন সুস্পষ্ট যে ধনতন্ত্র মানুষকে অর্থের দাসে পরিণত করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজার এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধরত ইউরোপীয় রাজশক্তিগুলি ইহাও দেখাইয়াছিল যে ধনতন্ত্রই যুদ্ধের প্রধান কারণ। এই সময় জার্মানিতে এক চিন্তা-নায়কের জন্ম হয়, তাঁহার নাম কার্ল মার্কস। তিনি বলিলেন যে বেকারি ও যুদ্ধ ধনতন্ত্রের অনিবার্য পরিণাম, উপরন্তু ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যন্ত্রের ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পাইবে বেকারি ও যুদ্ধ ততই উগ্ররূপ ধারণ করিবে। তিনি বলিয়াছেন, ইহা হইতে বাঁচিবার একটিমাত্র উপায়—সাম্যবাদ। জার্মানি ফ্রানস যেখানেই তিনি তাঁহার চিন্তাধারা প্রকাশ করিয়াছেন—সেখানকার রাজ-সরকার তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। পুঁজিপতিরা বুঝিতে পারিয়াছে যে সাম্যবাদ তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য। সাম্যবাদে তো সমগ্র সম্পত্তির মালিক ব্যক্তি না হইয়া সমাজ হইবে। সেসময় সকলকেই নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগসামগ্রী পাইবে। সকলের জন্যই উন্নতির পথ একই ভাবে উন্মুক্ত রহিবে। কেহ কাহারো ভৃত্য এবং দাস থাকিবে না। ধনী কী করিয়া এ-ব্যবস্থা পছন্দ করিবে? কিন্তু তখনো পর্যন্ত মার্কসের চিন্তাধারা বাতাসে ভাসিতেছিল। শ্রমিকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব খুব সামান্যই পড়ে। সেজন্য পুঁজিপতিদের বিরোধিতা সেরূপ তীব্র হইয়া উঠে নাই। বিশেষ করিয়া তাহারা যখন দেখিল যে কিছু লোক প্রলোভন সামলাইতে না পারিয়া পুঁজিবাদের সমর্থক হইয়া গিয়াছে।

পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে সকল দেশেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইউরোপে তাহার গতি অত্যন্ত তীব্র হইয়া ওঠে। পরিশেষে জার্মানিও এই বন্যা হইতে রক্ষা পাইল না। উপরন্তু প্রতিভাশালী জার্মানেরা যন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রয়োগে

আরো অধিক যোগ্যতা দেখাইল। পুঁজিবাদী সরকারগুলি সুযোগ বুঝিয়া পৃথিবীকে অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া লইল। জার্মানি দেখিল তাহার জন্য তো আর কোনো স্থান নাই। সে জানিত যে একমাত্র অস্ত্রের সাহায্যেই সে কোনো নূতন বাজারা দখল করিতে পারে, ইহার জন্য সে অনেক বৎসর ধরিয়া প্রস্তুতি চালাইল। এই আকাঙ্ক্ষা এবং এই প্রস্তুতির পরিণাম হইল ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধ। পুঁজিপতিদের কারখানাগুলি গরীবের রক্ত শোষণ করিয়াও তৃপ্ত ছিল না। সে বাজার এবং লাভের আশায় বিরাট আকারে নরহত্যা করিতে চাহিল। যে বলে যে মহাযুদ্ধ অষ্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা করিবার ফলেই অনুষ্ঠিত হয় সে হয়তো নিতান্তই সাধাসিধা ভাল লোক, না হয় জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলিতেছে। যুদ্ধ হইয়াছিল শোষকদিগের শোণিতপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। যুদ্ধে জার্মানির শোষকদিগের পরাজয় ঘটে, ফ্রানস এবং ইংলণ্ডের শোষকদিগের জয় হইল। এই শোষকদিগের যুদ্ধে একটি লাভ হইল যে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ রুশদেশে শোষকদিগের রাজত্বের উচ্ছেদ হইল। এখন সেখানে বিশ্বস্ততার সহিত যাহারা উপার্জন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে তাহাদের রাজত্ব। প্রথমে পৃথিবীর শোষকেরা যাহাতে রুশদেশে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইতে না পারে তাহার জন্য আপনাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু রুশদেশের শ্রমিক এবং কৃষকেরা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে। লেনিনের নেতৃত্বে সংস্থাপিত রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার আজ শোষকদের চোখে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। সমগ্র পুঁজিবাদী জগৎ দেখিতে পাইতেছে যে পৃথিবীর সকল শ্রমিক এবং কৃষক রাশিয়ার দিকে আশাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ও তাহাদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতেছে।

মহাযুদ্ধের শেষে শোষকদিগের শোণিতপিপাসার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করায় এবং রাশিয়ার বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ইউরোপের কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি হইল। সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম করিবার মত সামগ্রী প্রস্তুতই ছিল। প্রয়োজন ছিল ইহার সম্যক প্রয়োগ ও ব্যবহারের। কিন্তু শ্রমিকদিগের নেতৃত্ব যেসকল দুর্বলচিত্ত শিক্ষিতদিগের উপর ছিল—তাহারা তাহাদের ভীরুতা এবং দুর্বলতার জন্য জনগণকে দায়ী করিল এবং এইভাবে শ্রমিক-জাগরণের প্রচণ্ড প্রবাহ বিশৃঙ্খলিত হইয়া গেল। পুঁজিবাদী ও সুবিধাবাদীগণ

ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। পুঁজিপতি সেসকল উচ্চাভিলাষী সাম্যবাদী নেতাদের—যাহারা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্যের জন্য কোনো বড় কিছুর আশা করিতে পারিতেছিল না—সহজেই নিজের পক্ষে টানিয়া আনিল ইহার জন্য মাত্র দুইটি বস্তুরই আবশ্যকতা ছিল। এক—এই সকল আদর্শহীন নেতাদের নেতৃত্ব দান করা, কারণ ইহাতে পুঁজিবাদের কোনো ক্ষতি নাই। দুই—তাহাদিগের আর্থিক সহায়তা দেওয়া। আর এই প্রশ্নও তাহাদিগের নিকট অপ্রীতিকর ছিল না, কারণ তাহা না হইলে তাহাদের সমস্ত ধনসম্পদই শ্রমিকরা ছিনাইয়া লইবে। এই ভাবে ধনতন্ত্র এক নূতন রূপ—ফ্যাসিবাদ—ধারণ করিল। ফ্যাসিবাদ তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদকারী পুঁজিবাদের ছলচাতুরী প্রয়োগ করিল এবং জাতীয়তার নামে জনগণকে তাহার পতাকাতলে একত্রিত হইবার জন্য আহ্বান করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত সাম্যবাদী নেতাগণের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ফ্যাসিবাদকে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের অগ্রদূত মনে করিয়া সাহায্য করিল এবং এইভাবে পুনরায় পুঁজিবাদ আপনার ভিত্তি দৃঢ় করিল। যে-ফ্যাসিস্ত শোষক এবং শাসককে বজায় রাখিতে চাহে, সে কখনো দেশের ভিতর শ্রমিকের দুঃখ দূর করিতে পারে না। এইজন্য তাহারা অন্যদেশের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিল। ইহাই ইতালিতে ফ্যাসিবাদের জন্মকাহিনী।

জার্মানির শোষকেরাও মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু বিজেতা কখনো চাহে নাই যে পরাজিত শোষকেরা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। তাহারা জানিত জার্মানিতে শোষকদিগের বিনাশের ফল ইংলণ্ড এবং ফ্রানসের উপর সম্পূর্ণ পড়িবে। এইজন্য তাহারা তাহাদিগকে টিকিয়া থাকিতে দেয়। যুদ্ধের পর জার্মানিতে শ্রমজীবীরাও তাহাদের দেশের শোষকদিগের অত্যাচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে এবং উহাদের মধ্যে বিরাট জাগরণ দেখা দেয়। বাক্যে সুনিপুণ কিন্তু রণক্ষেত্রে কাপুরুষ শিক্ষিত নেতৃবর্গ তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল এবং স্বর্ণযুগ আনয়ন করিবার মিথ্যা ভরসা দিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। শোষকেরাও মূর্খ ছিল না। তাহারা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যখন সাম্যবাদীরা এইরূপে তাহাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছিল, সেসময় শোষকেরাও তাহাদের কার্যসিদ্ধি করিতেছিল। যুদ্ধের পরবর্তী কালের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া পুঁজিপতিদের বিশ্বাস হয় যে তাহাদের

স্বার্থ শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াও যাহারা মনে মনে পুঁজিবাদের সমর্থনকারী তাহাদের দ্বারাই সংরক্ষিত হইতে পারে। নাৎসিবাদ জার্মানিতে জাতীয় পরাজয় এবং অপমানের নামে লোকদিগকে তাহাদের দলে টানিতে আরম্ভ করিল। পুঁজিবাদীরা হিটলারের ব্রাউন সার্ট পরিহিত সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে লাগিল। নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় আহত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় শ্রমিকশ্রেণী ধীরে ধীরে হিটলারের প্রতারণায় ভুলিয়া গেল এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হিটলার তাহার শক্তিকে এরূপ দৃঢ় করে যে শাসনক্ষমতা তাহার দখলে আসিল। হিটলারের শাসনের চারি বৎসর ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭-এর মধ্যে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অর্ধেক হইল এবং পুঁজিপতিরা শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। ইহা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের নবরূপ ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ শ্রমিক জনগণের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিতে জানিত। হিটলার জার্মানির আত্মাভিমানকে ফিরাইয়া আনিবার এবং বৃহত্তর জার্মানি গঠনের কার্যসূচী তাহাদের সম্মুখে ধরিল। ফ্রানস এবং ইংলণ্ডের পুঁজিবাদ এবং পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অদূরদর্শিতার জন্য শ্রমজীবীশ্রেণীকে সেরূপ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সেজন্য তাহাদের খুব চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজন ছিল। ওদিকে জার্মানি পুঁজিপতিদিগের স্বার্থকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া শ্রমজীবী-শ্রেণীকে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার কড়া নেশায় মত্ত করিতেছিল। দুই দিকেই শোষকদের স্বার্থের প্রশ্ন ছিল। আর দুই দিকের শোষকেরাই নিজের নিজের স্বার্থের জন্য বিরাট প্রস্তুতি চালাইতেছিল।

তিন বৎসরের প্রস্তুতির পর হিটলার সর্বপ্রথমে জার্মানির আত্মাভিমান ফিরাইয়া আনিবার জন্য কিছু করিতে চাহিলেন। জাপান মাঞ্চুরিয়াকে গ্রাস করিয়া দেখাইয়াছিল যে ইংলণ্ড, ফ্রানস ও আমেরিকার পুঁজিপতি-শ্রেণী নিজেদের মধ্যে মতভেদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহে। সে ফ্রানস এবং ইংলণ্ডের ভিতরকার মতবিরোধের কথাও জানিত এবং মনে করিত যে ইংলণ্ড কেবল নিজেকে বাঁচাইতেই ব্যগ্র। ইহা ভাবিয়া ৭ মার্চ ১৯৩৬ সনে হিটলার জার্মান সৈন্যদিগকে রাইনল্যাণ্ডে নামাইয়া দিল আর ফ্রানস এবং ইংলণ্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। দুই বৎসর চারদিন পরে যখন মুসোলিনি আবিসিনিয়াতে ইংলণ্ডের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দিল তখন ১১ মার্চ ১৯৩৮ সনে হিটলার অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করিল। বাহিরের শোষকদের চোখ ধাঁধাইয়া গেল। কিন্তু জার্মান শোষকদের

পিপাসা ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না—আর জার্মান জনগণকেও দীর্ঘকাল দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনে রাজি করানো যাইতেছিল না। তাহাদের আলু খাইয়া জীবনধারণ করিতে রাজি করাইতে হিটলারকে কত কাণ্ডই করিয়া থাকিতে হইবে। ১৯৩৮ সনের অক্টোবর মাসে হিটলার সুদেতেনল্যাণ্ডকে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে কাড়িয়া লইল এবং ১৯৩৯ সনের ১৫ মার্চ সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে তাহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিল। সারা পৃথিবীর শোষকগণ আগামী যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিল। এই যুদ্ধের নরবলির নিকটে গত যুদ্ধ দাঁড়াইতেই পারে না। জার্মানিতে যেখানে আজ আট কোটি মানুষ শোষকদের জন্য নূতন বাজার দখল করিতে রক্ত বহাইতে প্রস্তুত সেখানে আকাশে সমুদ্রপথে এবং স্থলপথে যুদ্ধের জন্য ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন তাহাদের একটি আকাশ-যানের একবারের আক্রমণে পৌনে এককোটি লোকসংখ্যার লণ্ডন জনশূন্য হইয়া যাইতে পারে। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিরা কেবল সৈনিকই নহে—মৃতের অধিকাংশই হয় নিরপরাধ নাগরিক। কেহ শিশু বা বৃদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিবে না। সকল শোষকেরাই পরম উৎসাহে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যে-সময়ে মনুষ্যজাতি তাহাদের মধ্যে প্রথম শোষক সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সময় কি সে জানিত যে সেই শোষকেরাই বৃদ্ধিলাভ করিয়া তাহাকে আজ এই দুর্দিনের সম্মুখীন করিবে? ইহার বিনাশ ছাড়া বিশ্বের কল্যাণ নাই। শোষকগণ—তোমরা ধ্বংস হও!

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

জীবন ও সাহিত্য

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার আর পাঁচটা গ্রামের মত কনৈলা গ্রাম। গোবর্ধন পাণ্ডে সেই গ্রামে থাকতেন। পূজার কাজ করতেন। আর এ-ব্যাপারে বিষম কঠোরতা অবলম্বন করতেন। সকালে পূজাপাঠ সেরে তবে জলস্পর্শ করতেন। যার জন্য শরীর বিশেষ সুবিধার ছিল না। গাঁয়ের লোক তাকে পূজারী বলেই ডাকত। এরা সাংকৃত্য গোত্রের সরযূপারীন মলাঁবশাখার ব্রাহ্মণ।

পাশের গ্রাম পন্দহা। সেখানে রামশরণ পাঠকের একমাত্র সন্তান কুলবন্তীর সঙ্গে বিবাহ হয় গোবর্ধন পাণ্ডের। বিবাহের পর প্রায়ই কুলবন্তী পন্দহা গ্রামেই থাকতেন। সেইখানেই ১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল রবিবার—বৈশাখী কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। নাম কেদার। পরবর্তী জীবনে যিনি রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে খ্যাত হন। দাদু রামশরণ হায়দ্রাবাদে পল্টনে কাজ করতেন। তাই দিদিমাই ছিল বাড়ির গৃহকর্ত্রী। জ্ঞান হবার পর থেকে কেদারও নিজের মায়ের দেখাদেখি দিদিমাকেও 'মা' বলে ডাকত। জীবনের প্রথম পাঁচ বছর দিদিমার কাছেই লালিত পালিত হয়েছিল। বছরে মাত্র এক আধ সপ্তাহ পৈত্রিক গ্রাম কনৈলাতে আসত। বাল্যকালে কেদারের পিতাকে জানার বিশেষ সুযোগ হয় নি। বয়স যখন দশ বারো বৎসর তখনই পিতাকে জানার প্রথম সুযোগ পায়।

১৮৯৮ সালের শেষ দিকে পন্দহার কাছে রানী-কী-সরাই-এর এক মাদ্রাসায় কেদারের পড়াশুনা শুরু হয়। দাদুর ধারণা হিন্দির চেয়ে উর্দুর কদর বেশি, তাই মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। ইচ্ছা, পরে আজমগড়-এর মিশন স্কুলে ইংরেজী শিখবে। মাঝে বড়ৌরাতে এক পাঠশালায় হিন্দি অক্ষর পরিচয় হয়। লেখাপড়ায়

কেদার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। সারা বছরের পড়া তিন চার মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। বাকি সময়টা কেদারের কাছে অপচয় মনে হত। এর থেকে ভাল লাগত দাদুর কাছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানা গল্প আর শিকার-কাহিনী শুনতে। অজন্তা ইলোরার কথা,প্রসঙ্গে দাদুর গল্পটা বেশ মজার যা তার শেষ জীবন পর্যন্ত স্মরণ ছিল। দাদু বলেছিলেন, রাম বনবাসের সময় বিশ্বকর্মাকে দিয়ে পাহাড় কেটে নানা সুন্দর মূর্তি তৈরি করান। কাজ শেষ হলে বিশ্বকর্মা স্বর্গে যান ব্রহ্মাকে খবর দিতে। ইতিমধ্যে রাক্ষসরা এসে সেই জায়গা দখল করে নেয় এবং বসবাস শুরু করে। বিশ্বকর্মা ফিরে এসে রাক্ষসদের দেখে ক্রুদ্ধ হন এবং শাপ দেন তারা যেন পাথর হয়ে যায়। তাই কেউ নাচতে নাচতে পাথর হয়ে গেছে, কেউ বা বসে আছে, কেউ বা শুয়ে আছে। এখনো দেখলে মনে হয় হয়তো এখুনি জেগে উঠবে মূর্তিগুলি। কী জানি কোনোদিন হয়তো বা সত্যিই জেগে উঠবে। এমনি সব মজার মজার গল্প বলতেন রামশরণ। কেদারের শিশুমনে নানান দেশ আর তার নানান কাহিনী কৌতূহল সৃষ্টি করত।

১৯০২ সালে কেদারের উপনয়ন হয়। মানত থাকার জন্য বিন্ধ্যাচলের জাগ্রত দেবীর কাছে যেতে হয়। এইটাই তার জীবনে প্রথম বাড়ির বাইরে যাওয়া। বিন্ধ্যাচলের কাজ শেষ করে কাশী আর ফেরার পথে সারনাথের ধমেক্-স্তুপ দেখে।

১৯০৪ সালে কেদারের বিবাহের ব্যবস্থা হয়। তখন তার বয়স মাত্র এগার বৎসর। এত অল্প বয়সে বিবাহ কেদার পছন্দ করে নি। প্রচলিত সামাজিক রীতির প্রতি, সমাজের প্রতি 'বিদ্রোহে'র প্রথম অঙ্কুর সেই দিন থেকেই বপন হয় কেদারের মনে। এই বিবাহকে কেদার 'তামাশা' বলেই বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালে ১৯০৯ সালে তার গৃহত্যাগের অন্যতম কারণও এই বাল্যবিবাহ। পরে তিনি এই বিবাহকে একরকম অস্বীকারই করেছেন। সমাজের এই অন্যায় রীতি তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি।

রানী-কী-সরাই-এর পড়া শেষ হলে ১৯০৬ সালে নিজামাবাদে মিডিল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে বার্ষিক পরীক্ষার পর তিনি পালিয়ে কাশী যান, মাত্র কয়েক দিনের জন্য। এই সময় থেকেই ঘরের প্রতি তার বিরূপ ভাব প্রকট হতে আরম্ভ করে। তার কেবলই মনে পড়ে ১৯০৪ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে নতুন

বইয়ের মৌলভী ইসমাইলের সেই উর্দু কবিতা :

সৈর কর দুনিয়াকী গফিল জিন্দগানী ফির কহাঁ।
জিন্দগী গর কুছ রহী তো নৌজবানী ফির কহাঁ॥*

এই কটা লাইন তার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। জীবনের গতিকে বরাবর নতুন নতুন দিকে নিয়ে যায়। কাশী থেকে ফিরে পন্দহা এসেছে। ইতিমধ্যে দিদিমা মারা গেছেন। দাদু একলা। বাড়িতে দু' সেরের মত ঘি ভুল-ক্রমে ফেলে দেয়। ভয় দাদু যদি বকে। তাই একটা গরু বিক্রি করে টাকা বাইশ মত নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে রানী-কী-সরাই স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে রওনা হয়। সেটা ১৯০৭ সালের কথা। প্রথমে জোড়াসাঁকোতে কতগুলো বাড়ি-পালানো ছেলেদের সঙ্গে 'কম্যুন' জীবনযাত্রা শুরু। সেই সঙ্গে চলেছে কাজের সন্ধান। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে কাজ কে দেবে, চারদিকে শুধু খোঁজাই সার। কখনো বা খিদিরপুর ডকে, কখনো বা খিদিরপুরে কয়লা সড়কে ও কুলিবাজারে। মেহনতের কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে না, অথচ লেখাপড়াও বিশেষ জানা নেই। তাই চারমাস পর দাদুর খোঁজ করে আবার দেশে ফিরে যায়।

নিজামাবাদে লেখাপড়া শুরু হয়, কিন্তু মন বসছে না। সুযোগ মত আবার কলকাতায় পালিয়ে যায় ১৯০৯ সালে। এবার বেশিদিন বেকার থাকতে হয় নি। কিছুদিন রেলের মার্কাম্যানের কাজ করে। তারপর সুন্ধনী সাহুর কলকাতার দোকানে খাতা লেখার কাজ পায়। সেখানে চিঠিপত্র লেখার কাজ ও পড়াশুনার কাজও মাঝে মাঝে করতে হয়। এইভাবে ইংরাজীতে হাতেখড়ি হয়। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হত। শরীর ঠিক চলছে না। অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত কেদার আবার দেশে ফিরে আসে।

বাড়িতেও মন বসছে না, শুধু মনে পড়ে 'সৈর কর দুনিয়াকী!' বাড়ির লোক চায় কেদার লেখাপড়া শিখে বড় হোক। কিন্তু কেদারের ইচ্ছে সাধু হবে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তার টান। বাড়ির কাছে পরমহংস সাধুবাবা থাকতেন। কেদার সেখানে প্রায়ই যায়। বাবাজী কম কথা বলেন। তাঁর সেবাকাজ করেন হরিকরণ

* 'হে অবুঝ মানুষ, দুনিয়া ভ্রমণ করো, জীবন আর ফিরে পাবে না। জীবন যদিও কিছুটা থাকে, যৌবন তো আর থাকবে না!' ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা -কৃত অনুবাদ। দ্রঃ 'কৃষ্ণভারতী', সংখ্যা ১, বর্ষ ৩ (১৯৬৩)।

দাস। সে কিছু হিন্দি জানে। তার কাছে 'বিচারসাগর' ইতাদি কিছু বেদান্ত পুস্তক ছিল। সেগুলি কেদার পড়ে। হরিকিরণ কিছুদিন আগে বদ্রীনাথ ঘুরে এসেছে। তার কাছ থেকে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থভ্রমণের নানা কথা শোনে। কেদারের মন টানে হিমালয়ের সেইসব মনোরম জায়গায় যাবার জন্য। ১৯১০ সালের চৈত্রমাসে সাধু হবার বাসনা নিয়ে কেদার বেরিয়ে পড়ে। অযোধ্যা হয়ে হরিদ্বার পৌঁছায়। হরিদ্বারে এসে কেদার গুরুর সন্ধান শুরু করে। কিন্তু মনোমত গুরু পাওয়া যায় না। বেরিয়ে পড়ে হিমালয়ের দিকে। প্রথমে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, পরে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ। তখন সব পথটাই পায়ে হেঁটে যেতে হত। কেদার পয়সা না নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সাধুদের খাবার ব্যবস্থা তীর্থযাত্রী-রাই পুণ্যলোভে করে থাকে। যখন যা পেয়েছে তাতেই কোনো রকমে জীবন-ধারণ করা ছাড়া পথ নেই। এবারকার এই দুর্গম হিমালয়ে তার একমাত্র সাথী যোগেশ। পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাত্রা সেরে কাশী এসে পৌঁছায়। সেখানে চক্র-পাণি ব্রহ্মচারীর কাছে থাকে। সাথী যোগেশ কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে যায়। কেদার বিদ্বান সাধু হবার বাসনা নিয়ে সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করে। লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ পাঠ শুরু হয়। পরে দয়ানন্দ হাইস্কুলেও কিছুদিন পড়ে।

সারন জেলার (ছাপরা) পরসার মঠের মোহান্ত কাশী এসেছেন এক শিষ্যের সন্ধানে। কেদারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আলাপ আলোচনার পর কেদার তার শিষ্য হতে রাজি হয়। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে একদিন কেদার ছাপরায় এসে পৌঁছায়। পঞ্চমন্দিরের পিছনে পরসা মঠের আশ্রমে বসবাস শুরু করে। সাধু জীবনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয় কার্তিক শুক্ল একাদশী তিথিতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর। এখন থেকে তার নাম হয় রাম উদার দাস বা রামোদার সাধু। পরসায় সাধু জীবনের সবরকম ক্রিয়াকলাপ ছাড়া পড়াশুনার কাজও রামোদার করে চলেছেন। কারণ তাকে বিদ্বান সাধু হতে হবে।

১৯১৩ সালে বাড়ির লোক খোঁজ করে পরসার মঠে এসে উপস্থিত হয়। অনেক চেষ্টা করে মাত্র দিন দশেকের জন্য রামোদার সাধুকে (কেদারনাথ) বাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু যে সাধু হতে চায়, বেদ বেদান্ত পড়ে সত্যিকার বিদ্বান সাধু হবার যাঁর প্রবল বাসনা, ঘরে যাঁর কোনো আকর্ষণ নেই, দেশভ্রমণের নেশা যাঁকে পেয়ে বসেছে, তাকে আটকে রাখবে কে? আবার তাই পরসার মঠে ফিরে

আসেন রামোদার সাধু। কিন্তু পরসার মঠেও তার জ্ঞানপিপাসা পূর্ণ তৃপ্ত হচ্ছে না। সুযোগ বুঝে একদিন কাউকে কিছু না বলেই মাত্র ছ'টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পরসা থেকে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন শেষ হয়েছে। হিমালয় দর্শনও হয়েছে। এবার তাই নতুন দিকে যাত্রা করেন, দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজ হয়ে চিঙ্গেলপেটের তিরুমিশী মঠে এসে উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিন থেকে পড়া-শুনা করেন, পরে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত তিরুপতির বালাজী মন্দির দর্শন করেন। তার-পর মাদ্রাজ হয়ে পক্ষীতীর্থ-কাঞ্চীপুরম হয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম পর্যন্ত যান। সেখান থেকে চললেন বাঙ্গালোরে। সেখানে কিছুদিন থেকে বিজয়নগর-পুনা-বোম্বাই-নাসিক-ত্রম্বক-কপিলধারা হয়ে ওঙ্কারমান্ধাতা। সেখান থেকে উজ্জয়িনী, ডাকোর ও আমেদাবাদ। আমেদাবাদে থাকাকালীন গুজরাতী ভাষা চর্চাও করেন। ডাকোর থেকেই টাকা পাঠানোর জন্য লেখেন। টাকা এলে পরসার দিকে রওনা হন। তারপর রতলাম-ভূপাল-প্রয়াগ-কাশী হয়ে পরসার মঠে। এবারেও কিন্তু মঠে বেশিদিন থাকা হল না। পড়াশুনার জন্য চললেন অযোধ্যার দিকে। বেদ-বেদান্ত পড়াশুনা শুরু করেন। অযোধ্যায় তখন বৈরাগী আর বৈষ্ণবীর সংখ্যা বেশি। কাছেই প্রসিদ্ধ তীর্থ দেবকালীতে নবরাত্রের দিন বলি দেওয়া হয়। এই প্রথা অনেকের পছন্দ নয়। এক ব্রহ্মচারী এই বলিদান প্রথা রদ করতে বদ্ধপরিকর, আর এ-ব্যাপারে তিনি রামোদার সাধুর সাহায্য চান। সবাই মিলে নবরাত্রের দিন হাজির হয়েছেন প্রতিবাদ করার জন্য। ঘটনা শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পরিণত হয় এবং থানা-পুলিশ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। অযোধ্যায় এমনিভাবে দিন চলছে। ওদিকে বাড়ির লোক খোঁজ করে অযোধ্যায় এসে রামোদার সাধুকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনে।

ঘর তাঁর জন্য নয়। সেবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা হবার কথা। রামোদার সাধু বেরিয়ে পড়েন। প্রয়াগে কিছুদিন থাকার পর পড়াশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থায়ী ভাবে থাকতে গেলে আয়ের একটা পথ থাকা চাই। কোথাও চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯১৪ সালে খোঁজ পান আগ্রার আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে ছাত্রদের খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। তিনি সেখানে চলে যান। আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ে ভরতি হবার সময় আবার নিজের নাম কেদারনাথ লেখেন। হিন্দি,

উর্দু, সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষা শেখা হয়েছে—তাই এবার বিশেষ করে আরবী ভাষা শেখার জন্য সচেষ্ট হন। নিয়মিত সংবাদপত্রপাঠ এবং বিভিন্ন সমাচারপত্র থেকে দেশবিদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক খবরাখবরও রাখতে শুরু করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম হিন্দি লেখা প্রকাশিত হয় মীরাট থেকে প্রকাশিত 'ভাস্কর' পত্রিকায় আর উর্দু রচনা আগ্রা থেকে প্রকাশিত 'মুসাফির আগ্র'। আগ্রায় থাকাকালীন আর্যসমাজের কাজের জন্য তাঁকে বলা হয়। কিন্তু কেদার আরো জানতে চান, পড়তে চান। এ-ব্যাপারে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য আরো সময় চাই। ১৯১৬ সালে তিনি আগ্রা থেকে লাহোর চলে যান এবং সেখানে ডি এ বি কলেজে সংস্কৃত বিভাগে বিশারদ-এ ভর্তি হন।

গরমের ছুটিতে সবাই বাড়ি চলেছে। কিন্তু কেদারের ঘর কোথায়? উত্তর-প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হাজির হন লক্ষ্ণৌতে। এখানে তিনি আর্যসমাজের ভক্ত হিসাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছেন। কেদার এখন বেদ ঈশ্বর আর আর্যসমাজের প্রচারক। বুদ্ধদেবের নাম আগে শুনলেও বিশেষ কিছুই জানতেন না। লক্ষ্ণৌতে একটা ছোট বৌদ্ধ বিহারের খোঁজ পান। সেখানে স্থবির বোধানন্দ থাকেন। তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন। কেদারের জীবন বোধানন্দের সংস্পর্শে এসে নতুন দিকে যাবার মন্ত্র পায়। বোধানন্দ একজন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু। এইভাবে তিনি কেদারের পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে দেন।

লক্ষ্ণৌতে কিছুদিন থাকার পর কাশীতে আসেন। পাছে বাড়ির লোক খোঁজ পেয়ে যায়, তাই কেদার আর্যসমাজের কাজের জন্য অহরৌরাতে (মির্জাপুর) চলে যান। কিন্তু তাঁর পিতা ঠিক খোঁজ করে একদিন সেখানে উপস্থিত। কেদার আগে থেকেই সন্দেহ করেছিল। চুনারের কাছে অহরৌরা রোড স্টেশন থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য এসেছেন। গাড়ির দেরি আছে। এমন সময় ঐ স্টেশনেই পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হয়। কেদার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতাও পিছু নেয়। পিতার করুণ আবেদন—'আমাকে কেন এমন ভাবে হয়রান করছো, আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও।' সব লোক পিতার পক্ষে, কেদার তাই তাড়াতাড়ি দু'খানা টিকিট কেটে মহেশপুরের যাত্রা স্থগিত রেখে বেনারসের দিকে চললেন। ট্রেনে পিতা কেদারকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে

কেদার বাড়ি ফিরে যায়, কিন্তু সে নিজের মতে অটল। সে পিতাকে বলে—'আমি আপনার মনোভাব বুঝি, কিন্তু আমার জীবনের লক্ষ্য আলাদা, জোর জবরদস্তি করলে কোনো ফলই হবে না। নিজের মতে চলার জন্য যদি মৃত্যুমুখে পড়তে হয় তবুও আমি বিচলিত হব না। আমি কনৈলার অযোগ্য। আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারব না।' পিতাও পুত্রের মনোভাব বুঝে বিচলিত হয়ে পড়েন, বলেন, 'আমি আর তোমার জীবনের অন্তরায় হব না এবং কনৈলাতে না গিয়ে আমি বেনারসেই থাকব।' পিতা তাঁর কথার প্রথমটা রেখেছিলেন। আর এটাই পিতা-পুত্রের শেষ মিলন। কেদারও প্রতিজ্ঞা করেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আজমগড় জেলাতেই প্রবেশ করবেন না। তিনি সে-প্রতিজ্ঞা রেখে-ছিলেন। পিতার প্রতি এই ব্যবহার কেদারকে নিশ্চয়ই ব্যথিত করেছিল। তাই তাঁর প্রথম পদ্ধতি গ্রন্থ 'বুদ্ধচর্যা' পিতাকে উৎসর্গ করেন এই ভাষায়—'আমার গৃহত্যাগের ফলে যাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি দুঃখময় হয়েছিল সেই সাংকৃত্য গোত্রের স্বর্গীয় পিতা শ্রীগোবর্ধন-এর স্মৃতির উদ্দেশে।'

এইভাবে বাড়ির সাথে সব সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাধা পাওয়ার আর কিছুই থাকল না। কোথায় যাবেন ভাবছেন। মনে পড়ে গেল পরসা মঠের কথা। চললেন পরসার দিকে। মনেপ্রাণে আর্যসমাজী-প্রচারকার্যে লেগে গেলেন। চারি-দিকে আর্যসমাজের ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছেন। পুরোপুরি সাধু জীবন। দেশের খবর সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক খবরও পাচ্ছেন কানপুর হতে প্রকাশিত 'প্রতাপ' পত্রিকা থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্তির মুখে। রুশ দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের খবরও কিছু কিছু পাচ্ছেন। এই সময় কেদার মহেশপুরায় ছিলেন। রুশ বিপ্লবের খবর তাঁর জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তিনি এই প্রথম জানতে পারেন যে রুশ দেশে গরীব কিষান মজদুরের এক রাজনৈতিক দল আছে যারা গরীবের জন্য লড়াই করছে। সাম্যবাদের উপর তখনো হিন্দিতে কোনো বই ছিল না। তখন অঙ্কুররূপে যে-সাম্যবাদী চিন্তা কেদারের মনে দেখা দেয় তা পরে বৃহৎ মহীরুহ রূপে প্রকাশ পায়। ১৯১৮ সাল নাগাদ সাম্যবাদের উপর এক-খানা বই রচনার জন্য নোট রাখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ায় ১৯২২ সালে আবার সংস্কৃত পদ্যে লিখতে চান এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৩/২৪ সালে হাজারীবাগ জেলে বসে 'বাইসবী সদী' নামে হিন্দিতে রচনা করেন।

যদিও সেটা কাল্পনিক সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত কারণ তখনো পর্যন্ত মার্কস্‌বাদের উপর বিশেষ কোনো বই তিনি পান নি। লেখকের নিজের ভাষায়—'আমি তখন জানতাম না যে জগতে অনেকেই ইউটোপিয়া লিখেছেন। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে বোধহয় আমি এই বই লেখা বন্ধ করে দিতাম। কল্পনালোকে বিচরণ করে প্রায়ই তাঁরা কল্পনাকে প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন না যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজন হয়।'' 'বাইসবী সদী' প্রথম প্রকাশিত হয় আরো আট বৎসর পর আর এটাই ভারতীয় ভাষায় প্রথম সোশ্যালিস্ট ইউটোপিয়া।

১৯১৯ সালের এপ্রিলে কেদারনাথ লাহোর থেকে শাস্ত্রী পরীক্ষা দেন। সেই বছর কেউই পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। দেশের মধ্যে রৌলট অ্যাক্টের প্রতিবাদে হরতাল করার জন্য গান্ধীজী আহ্বান জানিয়েছেন। কেদার তখন লাহোরে। ৬ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস। লাহোরে ব্রাডলে হলে সভা আহ্বান করা হয়েছে। কেদারও সেই সভায় সামিল হন। হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত সভা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন দিক উন্মোচন করে। এরপর রৌলট অ্যাক্টকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল।

লাহোর থেকে তিনি প্রয়াগ ও জব্বলপুরে যান। উদ্দেশ্য—কাশীর 'ন্যায় মধ্যমা' ও কলকাতার 'মীমাংসা' পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। প্রথমটায় পাশ করতে পারেন নি, কিন্তু মীমাংসার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বোধানন্দের মাধ্যমে অনগারিক ধর্মপালের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন। ১৯২০ সালে তিনি ভারতের বৌদ্ধতীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে সারনাথ, এখান থেকেই বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তারপর বুদ্ধদেবের নির্বাণস্থল মাথাকুঁয়র (কুশীনগর) যান। সেখান থেকে ভারতসীমা পেরিয়ে নেপালের লুম্বিনীতে যান। এখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। ফেরার পথে কপিলাবস্তু, পিপরও, সহেট্‌-মহেট্‌, হওয়া, জেতবন (শ্রাবস্তী) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করে আবার নেপাল যান। রামায়ণ-খ্যাত জনক রাজার জানকী মন্দির দর্শন করেন জনকপুরে। সেখান থেকে রাজগীর-নালন্দা-বুদ্ধগয়া হয়ে কলকাতায় আসেন। ন্যায়শাস্ত্রের জন্য নদীয়া বিখ্যাত, তিনি নব্যন্যায় পড়ার জন্য

নদীয়ায় যান। কিন্তু রাতে মশার উৎপাতে অস্থির হয়ে সকালে কাউকে কিছু না বলেই নদীয়া ত্যাগ করেন। কলকাতা থেকে সাক্ষীগোপাল-পুরী হয়ে দক্ষিণের তীরুমিশী মঠে আসেন। এখানে তিনি মীমাংসা, বেদান্ত ইত্যাদি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। মাস চারেকের জন্য মহীশূরের কুর্গরাজ্যে থাকেন (১৯২১ সাল)। দেশের মধ্যে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। কুর্গে থাকাকালীন এ-সংবাদও তিনি নিয়মিত রাখতেন। 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ' আন্দোলনে ভারতের চারদিক তখন মুখরিত। কেদারনাথ ধর্মচিন্তা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন নিয়ে থাকলেও দেশের স্বাধীনতা ও প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন নন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার জন্য তৈরি হন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছেছে। ধর্ম-চর্চা ছাড়েনি ?

২

জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইনের অত্যাচারে দেশবাসী স্তম্ভিত। আত্মগ্লানি এবং প্রতিশোধের জন্য ভারতবাসী তৈরি। গান্ধীজী চম্পারন সত্যাগ্রহেও রৌলট আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। অমৃতসর (১৯২০), কলকাতা (১৯২১) ও নাগপুর (১৯২২) কংগ্রেসে গান্ধীজী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। রামোদার সাধু (কেদারনাথ) বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করেন। ১৯২২ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি যখন পাটনায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভার কাজ সেরে ছাপরায় জেলা কমিটির সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন, তখন গ্রেপ্তার হন। ছ'মাসের সাজা হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে অগস্ট (১৯২২) পর্যন্ত বক্সার জেলে থাকেন। জেলে থাকাকালে ব্রজনন্দন শাহীর কাছে ফারসী শেখেন। এই জেলে বসেই তাঁর প্রথম কাল্পনিক সাম্যবাদী পুস্তক 'বাইসবী সদী' সংস্কৃতে রচনা শুরু করেন এবং সংস্কৃতে "কুরান সার' লিখতে আরম্ভ করেন, যা পরে 'ইসলাম ধর্ম কী রূপরেখা' নামে

হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বেদান্ত সূত্রের টীকা সহজেলযাত্রীদের পড়ানোর উদ্দেশ্যে লেখেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ছাপরায় চলে যান। সেখানে তিনি কংগ্রেসের জেলা কমিটির সম্পাদক হন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। বুদ্ধগয়ার মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বৌদ্ধদের হাতে থাকা উচিত, এনিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরোধ বহুদিনের। কেদারনাথ গয়া কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনেন বুদ্ধগয়ার মন্দির বৌদ্ধদের হাতে অর্পণ করা হোক। অনগারিক ধর্মপাল তথা দেশ-বিদেশের বৌদ্ধভিক্ষুরা সমবেত হয়েছেন বুদ্ধগয়ায়। ব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করেন, যাতে প্রস্তাবটা আলোচিত হয় এবং পাশ করা যায়। এ-ব্যাপারে কেদারনাথ নিজেও দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান। ২২ ডিসেম্বর তার বাংলোতে গিয়ে খবরও দেন। বসার হুকুম হয়। এইভাবে আধঘণ্টা অন্তর তিন-চারবার খবর দিয়েও যখন দেখা হল না তখন বিরক্ত হয়ে ফিরে আসেন। আর ঐ প্রস্তাব চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জারের রাজনৈতিক ঝগড়ায় চাপা পড়ে যায়। নেতাদের এই ব্যবহার কেদারের জীবনে এক শিক্ষণীয় ঘটনা। তিনি এরপর জেলা কংগ্রেস সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার নেপাল যান শিবরাত্রি উপলক্ষে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার বাইরে দক্ষিণাকালী নামক এক পাহাড়ের গুহায় দেড়মাস আত্মগোপন করে থাকেন। সেখান থেকে ছাপরায় (২২ মার্চ ১৯২৩) বাবু মাধব-সিংহের বাড়ি পৌছে খবর পান চৌরিচৌরার ঘটনা উপলক্ষ্যে পাটনা-ভাষণের দরুন তার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, যে-ভাষণে তিনি বলে-ছিলেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য শহিদের রক্ত দেশমাতৃকার জন্য চন্দনস্বরূপ হবে।' গ্রেপ্তারের পর কেদারকে পাটনায় নিয়ে আসা হয় এবং বিচারে দু'বছর সাজা দিয়ে হাজারীবাগ জেলে পাঠানো হয়। জেলে তিনি ফারসী ও আবেস্তা ভাষা শেখেন। সহজেলযাত্রী স্বামী শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে উচ্চগণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র শেখেন। বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়েও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরো বিস্তৃত হয়। আর্যসমাজের প্রভাব দিন দিন কমে আসতে থাকে আর বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে (১৮ এপ্রিল ১৯২৪),

ছাপরায় যান। দেশে রাজনীতি নিয়ে উত্তেজনা তখন কমে এসেছে।

১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আবার হিমালয়ে যান। কাশ্মীর হয়ে লেহ লাদাখ পর্যন্ত, তারপর বিখ্যাত হেসিস গুহায়। ফেরার সময় অন্যপথে কিন্নরদেশ হয়ে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত যান। সেখান থেকে সিমলায় পৌছান।

দেশে কাউন্সিল-নির্বাচন শেষ হয়েছে। কংগ্রেস বড় দল হিসাবে দেখা দিয়েছে। কেদারনাথ প্রথম বৈঠকের দিন পাটনায় আসেন। কিষানদের সুযোগ সুবিধার জন্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। কোনো কোনো সদস্য সই করে। কেউ কেউ ইতস্তত করে সই করে। সেই সময় তাঁর ধারণা হয় কংগ্রেস কিষানের জন্য কিছু করতে এখনই প্রস্তুত নয়। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে যোগ দেন। সেই সুযোগে কামাক্ষ্যা ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান দেখে নেন। কংগ্রেস নতুন কোনো কার্যক্রম উপস্থিত করেনি। কেদারের সাম্যবাদী চিন্তাধারা উপযুক্ত সাথীর অভাবে সীমিত। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায় এবারকার লাদাখ ভ্রমণে। সারনাথে এসে খবর পান সিংহলের বিদ্যালঙ্কার বিহার এক সংস্কৃত অধ্যাপকের খোঁজ করছে। সুযোগ নিয়ে কেদার সিংহল যাত্রা করেন ১৯২৬ সালের মে মাসে।

সিংহলে তিনি ছাত্রও নন, যাত্রীও নন। এবার তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক। সেখানে তিনি 'ভারতের পণ্ডিত' হিসাবে খ্যাত হন। বিদ্যালঙ্কার পরিবেনে উনিশ মাস ছিলেন। অধ্যাপকতা ছাড়াও ত্রিপিটকের চল্লিশ খণ্ড পালি ভাষায় অধ্যয়ন করেন; এবং বসুবন্ধুকৃত 'অভিধর্ম কোষ'-এর সংস্কৃতে টীকাসহ সম্পাদনা করেন। সিংহলের দর্শনীয় স্থান কান্দি, অনুরাধপুর ইত্যাদিও পরিভ্রমণ করেন। বিদায় নেবার আগে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে বিদ্যালঙ্কার বিহার তাকে ত্রিপিটকাচার্য উপাধি প্রদান করে।

সিংহলে অবস্থানকালে তিনি তিব্বতী ভাষা শিখেছিলেন এবং যেসব গ্রন্থ ভারতে লুপ্ত তার সন্ধান করার জন্য তিব্বত যাওয়া স্থির করেন। রামেশ্বর থেকে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করতে করতে ছাপরায় আসেন। এর মধ্যে বিখ্যাত—মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, পুনা, সাঁচী, কনৌজ ইত্যাদি। ছাপরা থেকে পাটনায় যান। জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে সঙ্গে করে কাশীপ্রসাদ জায়সওয়ালের সাথে দেখা করেন।

তারপর তিনি রক্সৌল হয়ে নেপালে প্রবেশ করেন। শিবরাত্রির সময় নেপাল

প্রবেশে বাধা নেই, কিন্তু শিবরাত্রির পর নেপালে থাকা নিষেধ। কেদারনাথ বোধ-নাথ-এর এক লামার কাছে আত্মগোপন করে থাকেন এবং তিব্বতী ভাষা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার শিখতে থাকেন। তিব্বতী লামা সেজে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। লাসাতে এসে কেদারনাথ গোপনে কাজ করতে চান না। সুযোগ করে দলাইলামাকে তার উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একে পত্র দেন। তিব্বতে বিভিন্ন মঠ বিহার পরিদর্শন করেন, বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করেন। ফেরার সময়ে কালিমপঙ হয়ে পাটনায় আসেন (১০ জুন ১৯৩০)। কয়েকদিন ভারতে থেকে ২০ জুন ১৯৩০ সালে দ্বিতীয়বার সিংহল যাত্রা করেন। জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা। ২৮ জুন কান্দিতে সমারোহের সঙ্গে তিনি দীক্ষা নেন এবং গোত্র অনুযায়ী নামকরণ হয় রাহুল সাংকৃত্যায়ন। সেই থেকে তিনি ঐ নামেই খ্যাত হন। তিব্বত থেকে সংগৃহীত চিত্রের এক প্রদর্শনী কলম্বো-তে হয়। এখানেই তিনি বুদ্ধের জীবনী ও দর্শন-এর উপর বৃহৎ গ্রন্থ 'বুদ্ধচর্যা' রচনা শেষ করেন। বইখানা তিনি তাঁর পিতৃদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। সিংহলে তিনি গান্ধীজীর 'ইয়ঙ্গ ইণ্ডিয়া' নিয়মিত পড়ে দেশের রাজনীতির খোঁজ রাখতেন। ভারতের আন্দোলন থেকে দূরে থাকা অসহ্য মনে হয়। তিনি ভারতে ফিরে আসেন আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য।

১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে যোগ দেন। তারপর সারনাথে মুলগন্ধকুটী বিহার-এর উদ্বোধন উৎসবে যোগ দেন। সেখান থেকে নালন্দা রাজগৃহ হয়ে কলকাতায় আসেন। তৃতীয়বার সিংহলে যান ২৮ নভেম্বর ১৯৩১ সালে। পরে বৃটিশ বুদ্ধিস্ট মিশনের আমন্ত্রণে আনন্দ কৌসল্যায়নের সঙ্গে লণ্ডন যাত্রা করেন। ধর্মপ্রচার ছাড়া তিব্বত থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলির প্রদর্শনী লণ্ডন ও প্যারিসে হয়। রাহুল লণ্ডনে হাইগেটস্থিত কার্ল মার্কসের সমাধিতে মাল্যদানও করেন। লণ্ডন থেকে প্যারিসে আসেন। সেখানে আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারপর বার্লিনে যান। রাশিয়াতে যাবার ইচ্ছা কিন্তু সেবার সফল হয় নি। শেষে ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৩ সালে সিংহল হয়ে ভারতে আসেন।

কলকাতায় এসে খবর পান 'গঙ্গা' পত্রিকার বিশেষ পুরাতত্ত্ব সংখ্যা মুদ্রিত হয়ে গেছে। এই সংখ্যা রাহুল নিজে সম্পাদনা করেন। তারপর পাটনায় জায়সওয়ালজীর সঙ্গে দেখা করেন। প্যারিসে থাকার সময় সিলভ্যাঁ লেভি গিলগিট-লাদাখ এলাকায়

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাবার খোঁজ দেন। এ-ব্যাপারে জায়সওয়ালজী সহায়তা করতে রাজি। তিনি কিছু অর্থ ও একটা ক্যামেরা রাহুলকে দেন।

১৯৩৩ সালের মে মাসে গিলগিট-লাদাখ যাবার জন্য রাহুল শ্রীনগর আসেন। গিলগিট সোভিয়েত তাজাকিস্তান সীমানা বরাবর। ইংরেজ সেখানে সামরিক চৌকি বসিয়েছে। ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। রাহুল চেষ্টা করেও অনুমতি পান নি! গিলগিট যাওয়া হল না। জোজিলা-দ্রাসা হয়ে লাদাখের রাজধানী লেহর দিকে রওনা হন। হেসিস গুহা দেখে লেহতে প্রায় তিন মাস থাকেন। আগেই 'ধম্মপদ'-এর হিন্দি অনুবাদ শেষ হয়ে গেছে। এবার 'মজ্ঝিমনিকায়'-এর হিন্দি অনুবাদ করেন। এছাড়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ইতিহাস নিয়ে 'তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম' রচনা শেষ করেন। তিব্বতী ভাষা শেখানোর জন্য 'তিব্বতী বাল শিক্ষা', 'তিব্বতী পাঠবলিয়া' ও 'তিব্বতী ব্যাকরণ' রচনা করেন। লেহ থেকে রাহুল কুলু হয়ে লাহোরে যান (অক্টোবর ১৯৩৩)।

বিহার প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত হবে। জায়সওয়ালজী সেবার সভাপতি। রাহুল আদালতের রোমান লিপির পক্ষে কিছু বলেন। রাহুল বরোদায় প্রাচ্য সম্মেলনে হিন্দি বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অজন্তা, ইলোরা দেখে বোম্বাই হয়ে বরোদায় যান। সম্মেলনের কাজও বিভিন্ন ভাষণ ইংরাজীতে হয়। রাহুল হিন্দিতে ভাষণ দেন। বরোদা থেকে আমেদাবাদ-আবু-জয়পুর-চিতোর হয়ে মহাকালের মন্দির দর্শনের জন্য উজ্জয়িনী যান। সেখান থেকে সাঁচী-বিদিশা হয়ে প্রয়াগ আসেন। বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে (১৯৩৪) খবর পেয়ে সেবাকার্যের জন্য পাটনায় চলে আসেন। তিব্বত যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি রাহুলকে সম্মানীত সদস্য মনোনীত করে সেই বছর।

এবার কালিমপঙ হয়ে তিব্বত যাত্রা করেন। গ্যাংটক হয়ে লাসাতে পৌছান (মে ১৯৩৪)। সেখানে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকেন। এই সময় 'বিনয় পিটক' হিন্দিতে অনুবাদ করেন এবং 'সাম্যবাদী হী কোঁ্যা' রচনা শেষ করেন। বিভিন্ন মঠ আর বিহারে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান কার্য চালান। উদ্দেশ্য—লুপ্ত পুঁথিপত্রের খোঁজ। এবারকার তিব্বত যাত্রা রাহুলের জীবনে সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা। ৩ ও ৪ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে রাহুল বিভিন্ন পুঁথি থেকে আবিষ্কার করেন বিভিন্ন লুপ্ত

গ্রন্থ ; যার মধ্যে আছে ধর্মকীর্তির মূল গ্রন্থ 'বাদন্যায়', 'হেতুবিন্দু' ও 'ন্যায়বিন্দু'র উপর দুর্বেক মিশ্রের টীকা, মূল 'অভিধর্মকোষ', 'বাদন্যায় টীকা', 'সুভাষিত রত্ন-কোষ' (ভীমজ্ঞান সোম), 'অমরকোষ টীকা' (কামধেনু), 'প্রাতিমোক্ষসূত্র' (লোকোত্তরবাদ) ইত্যাদি। রাহুল কিছু পুঁথি নকল করে নেন, কিছু ফটো তুলে নেন। তার মধ্যে শাক্য মঠের ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক ভাষ্য' ও 'বার্তিকালঙ্কার' গ্রন্থের আলোকচিত্র অন্যতম। এইভাবে তিনি বহু সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ উদ্ধার করে নেপাল হয়ে ভারতে আসেন। কিছুদিন পর রাহুল কলকাতা হয়ে জাপানের দিকে রওনা হন (২ এপ্রিল ১৯৩৫)। পথে রেঙ্গুন-পেনাঙ-সিঙ্গাপুর হয়ে হংকং-এ থামেন। ৩ মে জাপানে পৌঁছান। জাপানে বিভিন্ন মঠ ও মন্দির পরিদর্শন করেন এবং ভাষণ দেন।

পাঁচ-ছয় বছর হল জাপানে স্বাধীনতার হাওয়া লেগেছে। মার্কসবাদ ও কমিউনিজ্‌ম্‌-এর চর্চাও চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্র। সে-হাওয়া ক্ষেতে কিষান আর কলে মজুরের কাছে পৌঁছেছে। শাসকবর্গ বিচলিত হয়ে 'কোদো'র (জাপানি ফ্যাসিবাদ) প্রচারে নেমেছেন। সাম্যবাদীদের উপর দমননীতি শুরু হয়েছে। হাজার হাজার লোক জেলে। জাপানের শাসনভার না সম্রাটের হাতে না ধনিক-শ্রেণীর হাতে। হয়াশী, অরাকী, মিনামী আর মসাকী—এই চারজন ফৌজি জেনারেলের হাতে সব ক্ষমতা। জাপানে সামন্তবাদ শেষ হয় নি। পুঁজিবাদও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যদিও পার্লামেণ্ট ও নির্বাচনকে স্বীকার করা হয়েছে তবুও শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হাতে সব ক্ষমতা। জাপান হয়ে রাহুল কোরিয়া যান, সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়া হয়ে ট্রান্স-সাইবেরিয়া রেলপথে মস্কোয় (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। রাহুলের ইচ্ছা ডাঃ ওল্ডেনবুর্গ ও শ্চের্বাৎস্কীর সঙ্গে দেখা করবেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন ওল্ডেনবুর্গ মারা গেছেন, অপরজন লেনিনগ্রাদে আছেন। মস্কোর বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে বাকুর দিকে যান। তেলের শহর বাকু। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে এক জায়গায় আগুন জ্বলত এবং জ্বালাদেবী হিসাবে পূজা পেত। রাহুল সেই অগ্নিমন্দির দর্শন করেন। পূর্বে বহু ভারতীয় এই মন্দির দর্শন করেছে। বহু ভারতীয়র নাম সেখানেও লিখিত আছে। রাহুল ইরান হয়ে দেশে ফেরেন। ইরানে প্রসিদ্ধ কবি হাফিজ, সাদী এবং মহাকবি ফিরদৌসীর সমাধি দেখেন। তারপর বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৩৬ সালে শিবরাত্রিতে রাহুল কাঠমাণ্ডু যান। কাঠমাণ্ডুতে মানসসরোবর-খ্যাত স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। দু'জনে লাহোরে সহপাঠী ছিলেন। নেপাল উপত্যকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণও দেন। ১৫ এপ্রিল কাঠমাণ্ডু থেকে বিদায় নিয়ে তিব্বতের দিকে রওনা হন। এটা তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রা। ২৫ মে স্মরণীয় দিন। বিভিন্ন তিব্বতী পুঁথির মধ্যে, শাক্য মঠে রাহুল আবিষ্কার করেন সম্পূর্ণ 'বার্তিকালঙ্কার' (প্রমাণ-বার্তিক ভাষ্য), কর্ণকগোমিকের 'স্ববৃত্তিটীকা' অর্থাৎ প্রমাণবার্তিকের টীকা ও ভাষ্য দুই-ই। এছাড়া দার্শনিক অসঙ্গের মহত্ত্বপূর্ণ পুস্তক 'যোগাচারভূমি'। রাহুল 'বার্তিকালঙ্কার' ও 'স্ববৃত্তিটীকা' অনুলিপি করে নিয়ে আসেন। এইভাবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রায় শাক্য, ঙোর (Ngor), শালু ইত্যাদি মঠ থেকে নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, প্রজ্ঞাকরগুপ্ত, জ্ঞানশ্রী, ধর্মকীর্তি ও রত্নকীর্তির বহু লুপ্ত ও মূলগ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এই খবর যখন বিদ্বানমহলে ছড়িয়ে পড়ে তখন দেশবিদেশ থেকে তাঁরা রাহুলকে অভিনন্দন জানান। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিভাগের আচার্য শ্চের্বাৎস্কী রাহুলকে দেখবার জন্য ভারতে আসতে চেয়েছিলেন। শ্চের্বাৎস্কী জায়সওয়ালের কাছে লিখেছিলেন, 'ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক গ্রন্থ আবিষ্কারকে স্মরণীয় করবার জন্য আমাদের অবিলম্বে একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করা উচিত।' জায়সওয়াল বলেন, 'ইহাদের যে-কোনো একটি গ্রন্থের সম্পাদনার জন্যই একজন ভারতবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃতি পাইতে পারেন।' আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি বলেন, 'বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে নেপালের অমৃতানন্দের পর এতবড় ভাষাজ্ঞানী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।'

শ্চের্বাৎস্কী ভারতে আসতে পারেন নি। রাহুলকে লেনিনগ্রাদে আমন্ত্রণ করেছেন; সংস্কৃত ভাষা শেখাবার জন্য। ইতিপূর্বে একবার রাশিয়ায় গেছেন। এবার বিশেষ আমন্ত্রণে যাচ্ছেন। ইরান হয়ে লেনিনগ্রাদে যান। সেখানে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি পর্যন্ত থাকেন। লেনিনগ্রাদ অবস্থানকালে এলেনার (লোলা) সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হয়। পরবর্তী কালে ইনি রাহুলপুত্র ইগোরের মাতা। আবার তিব্বত যাবার ইচ্ছা, তাই তাড়াতাড়ি রাশিয়া থেকে দেশে ফিরে আসেন, উজবেকিস্তান-তাজাকিস্তান হয়ে কাবুলের পথে। তিনি সোভিয়েত সম্বন্ধে বিভিন্ন

দিক নিয়ে বিশাল বই 'সোভিয়েত ভূমি' রচনা করেন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে চতুর্থ ও শেষবার তিব্বত যান। সেখানে প্রায় আটমাস থেকে অক্টোবরে দেশে ফিরে আসেন।

৩

তিব্বত থেকে কলকাতায় এসে ৫ অক্টোবর সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে এবার তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দেবেন। প্রায় এগার বৎসর তিনি রাজনীতির বাইরে আছেন। এই সময় তিনি অধ্যয়ন অনুসন্ধান ও পর্যটনে নিজের জীবনের একটা উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছেন। দেশের দারিদ্র্য ও অপমান একটা অভিশাপ যা তাঁকে পীড়িত করেছে। অসহযোগ আন্দোলনে রাহুল অংশ-গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বরাজ সম্বন্ধে যে-চিন্তা করতেন সেটা কিষান ও মজুরের জন্য এবং 'একমাত্র তাদের মুক্তির মধ্যেই দেশের জনতা দারিদ্র্য ও অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।' বিভিন্ন দেশবিদেশ ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেশের এই অসহনীয় অবস্থায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ভারতের মত এত গরীব দেশ আর নেই। মার্কসবাদ অধ্যয়ন করে তিনি শিখেছেন 'প্রকৃত বিপ্লবী হল কিষান ও মজুর। কারণ সব যন্ত্রণা তাদেরই সইতে হয় এবং শেষ লড়াইয়ে তাদের হারাবার কিছুই থাকে না। কিন্তু দৃঢ় সংগঠন তৈরি করতে না পারলে বিপ্লবী শক্তি প্রদর্শন করা যাবে না। লড়াইয়ের জন্য চাই শক্তিশালী সংগঠন আর এই সংগঠন দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে কিষান মজুরকে তার অভিষ্ট পথে নিয়ে যাবে। এই লড়াই পরিচালনার জন্য চাই উপযুক্ত কর্মী—যারা দূরদর্শী, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, যারা কোনো প্রলোভনে বশীভূত হবে না। রুশ বিপ্লব সফল হয়েছে কারণ কমিউনিস্ট পার্টি সেই বিপ্লবকে পরিচালিত করেছিল।' ভারতে সাম্য-বাদী চিন্তাধারার লোক থাকলেও তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয় নি। রুশ বিপ্লব রাহুলকে নতুন দৃষ্টি দান করেছে, পরে মার্কস্‌বাদী হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি সাম্যবাদের একনিষ্ঠ প্রচারক। ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার সঙ্গে পরিচয় বছর পাঁচেক আগেই হয়েছে। রাহুল এবার ডঃ সাহার কাছে বেআইনী

কমিউনিস্ট পার্টির খোঁজখবর নেন এবং মহাবোধি সোসাইটিতে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন। পরে এক বিবৃতিতে বলেন, এবার তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ত্যাগ করে প্রথমে দেশের পরিস্থিতি অধ্যয়ন করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেবেন।

রাহুল পাটনায় চলেছেন। তিব্বত থেকে আনা পুঁথি ও চিত্র সেখানকার যাদুঘরে দান করেন। বর্তমানে 'রাহুল বিভাগে' তা সংরক্ষিত আছে। প্রথমে মজুরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে ডালমিয়ানগরে যান। পরে দারভাঙ্গায় বিহার প্রাদেশিক কিষান সভায় যোগ দেন। তিনি তাঁর ভাষণ ভোজপুরী (মল্লিকা) ভাষায় দেন। সেখান থেকে মজফ্ফরপুরে যান বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে। জয়প্রকাশ নারায়ণ রাহুলকে সদস্যপদ নেবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু মাসানীর সোভিয়েত-বিরোধী নীতির জন্য রাজি হন না। জয়প্রকাশ রাহুলকে বোঝায় ওটা পার্টির বক্তব্য নয়, মাসানীর ব্যক্তিগত মত। তখন রাহুল সদস্যপদ গ্রহণ করেন। হরিনগর (চম্পারন) চিনিকলে হরতালের খবর পেয়ে সেখানে যান। চিনিকলের মালিক একজন কংগ্রেসী পুঁজিপতি। একদিকে এরা দেশের স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে আর অন্যদিকে কিষান মজুরকে শোষণ করছে। সেই সময়ে বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ছিল। কিন্তু যে-কংগ্রেসী মজুর-কিষানের ভোটে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে, তারাই সেই কিষান-মজুরের বিপক্ষে মিল মালিকের পক্ষ নিয়ে হরতাল ভাঙার জন্য সবরকম হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেখান থেকে রাহুল প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি হয়ে রাঁচী যান ও জনভাষা ও লোকসংগীতের উপর ভাষণ দেন।

১৯৩৯ সালে কিষান সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্য রাহুল আমওয়ারীর (ছাপরা জেলা) দিকে যান। ২৪ ফেব্রুয়ারি সত্যাগ্রহের দিন ঠিক হয়। এক কিষানের ক্ষেত থেকে আখ কাটা হবে যেটা জমিদার অন্যায়ভাবে দাবি করেছে। জমিদারের সশস্ত্র গুণ্ডাদের আক্রমণে রাহুল আহত হন। তাঁর মাথা ফেটে যায়। রাহুলসহ বাহান্নজন গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু জমিদারের কথা অনুযায়ী তার নিজের আঠাশজনকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। এবার রাহুল চারমাস জেলে ছিলেন। প্রথমে সীওয়ান, পরে ছাপরা জেলে। এই সময় রাহুলকে কোমরে দড়ি বেঁধে

নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে নির্যাতনের প্রতিবাদে অনশন করেন ১৮—২২ মার্চ পর্যন্ত। অনশন চলাকালীন ২০ মার্চ তিনি 'তুমহারী ক্ষয়' রচনা শেষ করেন। এছাড়া একখানা বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস 'জীনে কে লিয়ে' রচনা শুরু করেন। বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে যাবার সময় রাহুলকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে রাহুল সেটা গৌরবজনকই মনে করেন। আবার ১—১০ মে পর্যন্ত নির্যাতনের প্রতিবাদে দ্বিতীয়বার অনশন করেন এবং ১০ মে জেল থেকে ছাড়া পান। সেখান থেকে তিনি আবার ছিত্তৌলা সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন (জুন ১৯৩৯) এবং গ্রেপ্তার হন। বিচারে দু'বছরের সাজা হয়। কিন্তু সতেরদিন অনশন করার পর ৯ জুলাই ছাড়া পান। রাহুল এবার কিষান সংগঠন তৈরি করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটপরিবর্তন হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। হিটলার একের পর এক দেশ দখল করে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পোল্যাণ্ডে জার্মানবাহিনী আক্রমণ শুরু করলে ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাহুল বুঝতে পারেন বেশিদিনের জন্য হয়তো জেলের বাইরে থাকা যাবে না। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসছে। সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমিউনিস্ট সদস্যরাও যোগ দিচ্ছেন। রাহুল পাটনা থেকে ওয়ার্ধায় যান। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে; অপর দিকে বামপন্থীরা সংগ্রামে নামতে চান। রাহুল ইতিমধ্যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। যে-পার্টির কথা এতদিন ভেবেছেন এবং পড়েছেন, ওয়ার্ধাতে সেই পার্টিকে প্রত্যক্ষ করে রাহুল গর্বিত। ১৯৩৯ সালে রাহুল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। বিহার প্রদেশে তখনো পার্টি গঠিত হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে এর আগে আলাপ হলেও সদস্য হিসাবে ওয়ার্ধাতে তিনি উৎসাহের সঙ্গে সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারপর রাহুলের ভাষায় 'অন্য এক নতুন জীবন শুরু হল।' ১৯ অক্টোবর এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন মুঙ্গেরে বিহার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাহুলও অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত আছেন। এরপর পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাহুল দু'মাস আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময় তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হিন্দিতে অনুবাদ করেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালে

তিনি মতিহারিতে প্রাদেশিক কিষানসভার সভাপতি হন এবং পরে নিখিল ভারত কৃষকসভার সভাপতি হন, যার অনুষ্ঠান মে মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের পলাশা গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ভারতরক্ষা আইনে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার হন (১৫ মার্চ ১৯৪০)।

মোট উনত্রিশ মাস জেলে ছিলেন (মার্চ ১৯৪০ – জুলাই ১৯৪২)। প্রথমে হাজারীবাগ জেলে, পরে দেউলি ক্যাম্পে (রাজস্থান) থাকাকালীন রাহুল হিন্দি ভাষায় মার্কসবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই রচনা করেন। 'বিশ্ব কী রূপরেখা' বৈজ্ঞানিক বই বিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধীয়। 'মানব সমাজ' আদিম যুগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সমাজ বিকাশের রূপরেখা। ভারতীয় সমাজ নিয়ে মার্কসবাদ প্রয়োগ রাহুল এই প্রথম করলেন, তাই ভারতীয় ভাষার মধ্যে এটাই প্রথম উদাহরণ। বিশ্বের সবরকম দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশের উপর লিখলেন 'দর্শন দিগ্‌দর্শন'। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের উপর, বিশেষ করে তৎকালীন ভারতের অবস্থায় মার্কসবাদ কীভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তার উপর ভিত্তি করে লিখলেন 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ'। এছাড়া ধর্মকীর্তির স্ববৃত্তি (প্রমাণ-বার্তিক) তিব্বতী ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

হিটলার-বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতিরও পরিবর্তন হয়। ফলে কংগ্রেসী কাগজওয়ালারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ শুরু করে। ১৯৪২ সালে ১৬ জানুয়ারির রোজনামচায় রাহুল লিখেছেন, 'কিন্তু এত করেও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের পথে ঠিক থেকে, মহান আদর্শকে সামনে রেখে মার্কসবাদীরা এগিয়ে যাবে, তাদের প্রভাব এইভাবে খতম করা যাবে না। সাধারণ লোক (কিষান, মজদুর) কমিউনিস্টদের প্রতি এই আক্রমণে বিচলিত হবে না। আমি 'রাশিয়ার বন্ধু' – একে জনতা গালি মনে করে না, যতক্ষণ না ওদের বোঝান যাবে রাশিয়া খারাপ, শয়তান এবং রাশিয়া কিষান-মজুরের হিতের শত্রু। যদি রাশিয়া ভাল হয় তবে রাশিয়ার বন্ধু কেন খারাপ হবে।'

রাহুল এবার শুরু করেন গল্প ও উপন্যাস লিখতে। ইচ্ছা ভারতীয় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু রচনা করার। ত্রিপিটক পড়ার সময় রাহুল দেখতে পান ভারত-ইতিহাস কেবল রাজতন্ত্রের ইতিহাস নয়। সেই সময় বহু প্রজাতন্ত্রও

ভারতে ছিল—যথা বৈশালীতে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র। এদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে 'সিংহ সেনাপতি' রচনা করেন। 'মানব সমাজ' -এর বিষয়বস্তু নিয়ে ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের উপর ভিত্তি করে কাহিনী শুরু করেন। এইগুলি 'ভোল্গা সে গঙ্গা' নামে প্রকাশিত হয়। ভোজপুরী ভাষায় সাতখানা নাটক রচনা করেন। চারখানায়—'জাপনিয়াঁ রাছছ্', 'দেশ রচ্ছক্', 'জর্মনওয়াকে হার নিহিচয়' ও 'ই হামার লড়াই'—ফ্যাসিবিরোধী ভাবকে প্রকাশ করেছেন। 'ঢুনমুন নেতা'-র মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিচারধারার বিশ্লেষণ ; 'নইকী ঢুনিয়াঁ' ও 'ঔন জোঁক'-এর মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তা এবং 'মেহরারুনকে ঢুরদসা'-র মধ্যে নারীজাতির হীন অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ প্রস্তাব কংগ্রেস-মুসলিম লীগ রাজনীতি নিয়ে দেশের মধ্যে নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয়। রাহুল এই সময় (৯ জুন) 'পাকি-স্তান আউর জাতীয়কী সমস্যা' লেখেন। যার ভিতর তিনি ভারতকে এক বহু-জাতিক রাষ্ট্র হিসাবে মেনে সমস্যা সমাধান করার কথা বলেছেন। ২৩ জুলাই ১৯৪২ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

৪

বাইরের দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে মনোভাব, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সভাসমিতি ও সংবর্ধনায় এই-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। বর্তমানে কংগ্রেস ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে চায়। কিন্তু রাহুলের মতে এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে জাপানি ফ্যাসিবাদ ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। রাহুল বলেছিলেন—'যারা কোরিয়া ও চীনে জাপানি খুনী শাসনের ইতিহাস জানে তারা এ-আশা কখনই করবে না যে জাপান ভারতকে স্বাধীন করে দেবে।'

সমর্থন করতে পারেন নি। পাটনা থেকে তিনি ১ অগস্ট কলকাতা আসেন। কমিউনিস্ট পার্টির আইনসঙ্গত হওয়া উপলক্ষে টাউন হলে অনুষ্ঠিত উৎসবসভায় সভাপতিত্ব করবেন। বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে টাউন হল-এলাকা। এর আগে বহু বড় বড় সভায় যোগ দিলেও আজকের সভা তাঁর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রাহুলের ভাষায়, 'বাঙালী তরুণেরা নিজেদের যোগ্যতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রবাহিনী আর এরাই ভারতকে স্বাধীনতার জন্য শহিদ হতে শিখিয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিকেরা বিভিন্ন আন্দোলনের অগ্রদূত। আর তারাই সমবেত হয়েছে এই মহতী সভায়।'

কংগ্রেসের অগস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে। চারিদিকে অশান্ত জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। ইংরাজের দমননীতিও পুরোদমে চলছে। এই আন্দোলন নেতৃত্বহীন, অসংঘটিত ও অনুশাসনবিহীন। তাই ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করে। রাহুল অগস্ট আন্দোলনকে অগস্টের তুফান বলে বর্ণনা করেছেন।

অক্টোবরে তিনি আবার কলকাতায় আসেন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি শিক্ষাশিবিরে যোগ দেবার জন্য। সেই সময় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ভারত থেকে কিছু বুদ্ধিজীবিকে রাশিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। রাহুলের নামও তার মধ্যে আছে। সেখান থেকে বোম্বাই যান পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে মার্কসবাদী সাহিত্যের অনুবাদ ও অন্য কাজে। তিনি এই সময় লেনিনের 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' হিন্দিতে অনুবাদ করেন এবং 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা' সংকলন কাজ আরম্ভ করেন। বোম্বাই থাকাকালে খবর পান অন্যতম প্রাচ্যভাষাবিদ্ ভারতবন্ধু আচার্য শ্চের্বাৎস্কী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

১৯৪৩ সালে রাহুলের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। যে-প্রতিজ্ঞা তিনি একদিন করেছিলেন তাকে ভীষ্মের মত রক্ষা করেছেন। আজমগড় জেলায় প্রবেশ করেন নি একদিনের জন্যেও। এখন আর কোনো বাধা নেই। কিন্তু যে-জন্মভূমিকে যে-পরিচিত গ্রামকে তিনি বহুদিন আগেই ছেড়ে এসেছেন আজ সেই রূপ কি তিনি আবার দেখতে পাবেন? পাবেন কি সেইসব পরিচিত মুখ যাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাল্যকালের কত মধুর স্মৃতি? তবু জন্মস্থান! 'এক নতুন তীর্থযাত্রা' চৌত্রিশ

উত্তরাখণ্ডে চলেছেন। উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রীর পথে ধরালী থেকে নেলাং এবং তিব্বতসীমান্তে। ফিরলেন মসুরী(মুসৌরি), জৌনসার ও দেরাদুন হয়ে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তিনি তাঁর 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'-র জন্য বিয়াল্লিশ জনের জীবনীও সংগ্রহ করেন।

১৯৪৪ সালে মার্চ মাসে নিখিল ভারত কৃষকসভার অধিবেশন। এর আগের বারে (১৯৪০) রাহুল সভাপতি ছিলেন, কিন্তু গ্রেপ্তার হয়ে যাবার জন্যে যোগ দিতে পারেন নি। এবারের সভায় যোগ দেন। ফ্যাসিবাদ পরাজয়ের মুখে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি-সমাবেশের দিক থেকে ঐ সম্মেলন স্মরণীয়। অন্ধ্রে থাকার সময় সেখানকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে বোম্বাই যান (৬ এপ্রিল ১৯৪৪)। এইসময় তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি পড়েন, পরে 'মন্বন্তর'ও পড়েন। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে রাহুলের মন্তব্য—'তিনি সিদ্ধহস্ত কলাচার···তিনি (তারাশঙ্কর) আশপাশের পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূষণ নয় ভূষণই মনে করেন'। চারখানা বই লেখার চিন্তা মাথায় এসেছে এর মধ্যে। প্রথমে সরদার পৃথ্বীসিংহের জীবনী স্থরু করেন, পরে 'হিন্দি কাব্যধারা'য় হাত দেন। প্রয়াগে থাকার সময় 'জয় যৌধেয়' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। ভারতে রাজতন্ত্র ছাড়াও যে প্রজাতন্ত্র ছিল সে-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য নীরব। পালি সাহিত্য পাঠ করে তিনি এ-বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেন এই উপন্যাসের মাধ্যমে। তারপর মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সহজ ভাষায়—হিন্দি ও ভোজপুরীতে—'ভাগো নহীঁ, দুনিয়াকো বদলো' রচনা করেন। ১৯৪০ সাল থেকে রাহুল 'মেরী জীবনযাত্রা' রচনা শুরু করেন। এই আত্মজীবনীতে নিজের জীবনের ঘটনা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ করেন। এইসময় ১৯৪৭ সালের ঘটনা পর্যন্ত যোগ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের আগে এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় না।

পাসপোর্ট সমস্যার সমাধান হয়েছে। ইরানের পথে সোভিয়েত রাশিয়ায় যাবার জন্য ১৯৪৪ সালে অক্টোবর মাসে ভারত ত্যাগ করেন। ২ নভেম্বর কোয়েটা থেকে ট্রেনে ইরান-সীমা জাহিদান পৌছান, সেখান থেকে তেহরান। যুদ্ধ তখনো

শেষ হয় নি। রাহুলকে ২ জুন ১৯৪৫ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত মাস তেহ্‌রানে অপেক্ষা করতে হয়। জার্মান ফ্যাসিস্তদের পরাজয়ের পর সোভিয়েত-প্রবেশের ভিসা পান। তিনি বিমানে সোভিয়েতে যান। প্রথমে বাকু, পরে স্তালিনগ্রাদে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরাজয় সূচনা স্তালিনগ্রাদ থেকেই শুরু। সোভিয়েত লালফৌজ ফ্যাসিস্ত জার্মান বাহিনীকে বার্লিন পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে নিয়ে যায়। তারপর ৫ মে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। রাহুল সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত ঐতিহাসিক স্তালিনগ্রাদে এসেছেন, যুদ্ধের একমাস পরেই। তিনি স্তালিনগ্রাদকে সারা বিশ্বের এক পবিত্র 'ঐতিহাসিক স্থান' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ পৌছান ৪ জুন। এই সময় সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির ২২০তম জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। ভারত থেকে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা এসেছেন। রাহুল তাঁর কাছ থেকে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নেন এবং ডঃ সাহার স্বাগত অভিনন্দন সংস্কৃতে অনুবাদ করে দেন।

লেনিনগ্রাদে প্রথমে রাহুল রুশভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। তিনি এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখাবার জন্য এসেছেন। পরে সংস্কৃত ছাড়া হিন্দি ও তিব্বতী ভাষাও শেখান। কালিয়ানোফ, স্থলেকিন, রাবন্নিকফ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাচ্য তথা ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রায় পঁচিশ মাস সোভিয়েত দেশে ছিলেন। এবার বিস্তৃতভাবে রাশিয়াকে দেখার ও জানার সুযোগ পান। যুদ্ধের শেষে কীভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দিক থেকে রাশিয়া এগিয়ে চলেছে তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

রুশ ভাষা ছাড়া এশিয়ার তাজিক প্রভৃতি ভাষাও তিনি শেখেন এবং মধ্য এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শেষ করে ৫ জুলাই ১৯৪৭ সালে লেনিনগ্রাদ থেকে বিদায় নেন। জাহাজে স্টকহলম্ (সুইডেন) হয়ে লণ্ডন যান (১৪ জুলাই)। লণ্ডনে কয়েকদিন থেকে ৩১ জুলাই জাহাজে ভারত অভিমুখে রওনা হন। জাহাজের মধ্যে ১৫ অগস্ট ১৯৪৭ কী ভাবে প্রতিপালন করা যায় সে-বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় যাত্রীরা আলোচনা করছিল। রাহুল এই উৎসব উদ্‌যাপন আলোচনায় অংশ নেন। 'এই দিনটা আমাদের দেশের কাছে সব থেকে বড় ঘটনা, কারণ ঐদিন যে-ইংরেজ

সৈনিকরা তরবারির জোরে এতদিন ভারত দখল করে রেখেছিল তারা ভারত ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা হতে চলেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য কত শহিদ প্রাণ দিয়েছে এবং তার ফলে নবজাগৃতির জন্য ইংরেজ বুঝল আর শাসন করা সম্ভব নয়। ভারতীয় নৌ-সৈনিকরা বিদ্রোহের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। দেউলিয়া বৃটিশ সরকার তাই তাড়াতাড়ি ভারত ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।' যথারীতি ১৫ অগস্ট জাহাজের মধ্যে পতাকা উত্তোলন, মিষ্টান্ন বিতরণ ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। ১৭ অগস্ট রাহুল ভারতে পদার্পণ করেন। লালঝাণ্ডা নিয়ে বোম্বাইয়ের মজুরেরা অভিনন্দন জানাতে এসেছে। সঙ্গে মিরজকর, অধিকারী প্রভৃতি কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আছেন। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপলক্ষে সজ্জিত বোম্বাই নগরী। তিনি এক নতুন ভারতে প্রবেশ করে আনন্দিত।

৫

বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় রুশদেশ ও অন্য বিষয়ে ভাষণ দেন। বুদ্ধ ও মার্কস্ সম্বন্ধে এক ভাষণে তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা করেন। রাহুল নিজে আর্যসমাজী চিন্তাধারা থেকে বৌদ্ধ যুক্তিবাদ, অনীশ্বরবাদ, বিচার-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও আর্থিক সাম্যবাদের দিকে বিবর্তিত হন। এরপর মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারা তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। বুদ্ধ বিশ্বের সব কিছু অনিত্য হিসাবে দেখেছেন। সবকিছু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন তথা ক্ষণিকবাদ বুদ্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু মানুষকে তার ইচ্ছানুসারে বস্তুস্থিতিকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তন করার পথনির্দেশ মার্কস্‌ই প্রথম শিখিয়েছেন। মার্কস্ বস্তুকে শুধু ব্যাখ্যাই করেন নি পরন্তু পরিবর্তন করার কথাই বলেছেন।

সেপ্টেম্বর ৬-৮ তারিখে প্রয়াগে প্রগতিশীল লেখক সংঘের অধিবেশনে রাহুল সভাপতিত্ব করেন। ভাষা ও সাহিত্যের উপর আলোচনা হয়। হিন্দি, উর্দুর প্রশ্নে তাঁর মতে উর্দুকে নাগরীলিপিতে রূপান্তরিত করলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। এর অর্থ এই নয় যে আরবী লিপি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। আরবী-ফারসী লিপিতে সীমিত থাকার দরুন পাঠক উর্দু-সাহিত্য পাঠে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রয়াগ থেকে বেনারস-সারনাথ-ছাপরা-পাটনা হয়ে কলকাতায় পৌছান ২১ সেপ্টেম্বর এবং স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের বাড়িতে অতিথি হন। কলকাতায় তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাষাসমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করেন। তিনি তিব্বত থেকে সংগৃহীত অসঙ্গের মহান গ্রন্থ 'যোগাচারভূমি' সম্পাদিত করেছেন। পরে বাঙলার কালজয়ী কবি কাজি নজরুল ইসলামকে দেখতে যান। এই সময় নজরুলের বয়স মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর। কিন্তু ছ'বৎসর আগেই তার মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। নজরুল এখন সুখদুঃখের অতীত। কবির আর্থিক অবস্থা জেনে রাহুল ব্যথিত হয়ে মন্তব্য করেন—'বর্তমান সমাজে এটা কী গৌরবের ব্যাপার! একদিকে কবির বই প্রকাশ করে প্রকাশক প্রচুর লাভ করে চলেছে, অন্যদিকে কবি অর্থকষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন।'

কলকাতা থেকে মধ্য ভারত হয়ে তিনি প্রয়াগে আসেন এবং পুস্তক রচনায় হাত দেন। রাশিয়ায় অবস্থানকালে মধ্য এশিয়ার অন্যতম তাজিক লেখক সদরুদ্দিন আইনীর বই পড়েন এবং উর্দুতে অনুবাদ করেন। এবার তিনি তাঁর দু'খানা উপন্যাস 'দাখুন্দা' ও 'গুলামান' (জো দাস থে) হিন্দিতে অনুবাদ করেন। এরপর সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের উপর একখানা বই রচনা করেন, যার মধ্যে সেখানকার সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় বর্ণনা করেন। জিপসীদের ভাষা নিয়ে একটা লেখাও এই সময় শেষ করেন।

স্বাধীনতা পাবার পর বোম্বাইতে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন-এর প্রথম অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯৪৭) অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রাহুল। পরিভাষা ও লিপি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী। এই সম্মেলনে ভাষণপ্রসঙ্গে তিনি হিন্দি-উর্দু প্রসঙ্গে যে-মত ব্যক্ত করেন এবং মুসলমানদের শতাব্দীব্যাপী সাংস্কৃতিক বয়কট পরিত্যাগ করে সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের যে-আহ্বান জানান তা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় অফিসে রাহুল এনিয়ে আলোচনা করেন। তারা চাইছে ভাষণ থেকে ঐ অংশ বাদ দিয়ে দিতে। কিন্তু ভাষণ ছাপা হয়ে গেছে। তাই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। রাহুল ওটা বাদ দিতে গররাজি ছিলেন না, কারণ তিনি ব্যক্তিগত বিচার অপেক্ষা দলগত বিচার এবং অনুশাসনকে আবশ্যকীয় গুণ হিসাবে মনে করেন। সামান্য ব্যক্তিগত বিচারের জন্য

পার্টি ছাড়া রাহুলের পছন্দ নয় ? যাই হোক এরপর তিনি আর দলীয় সদস্য পদে থাকেন না। এবার তিনি পরিভাষার কাজ শুরু করেন। হিন্দি 'শাসন শব্দকোষ' শেষ করে হিমালয়ের দিকে চলে যান।

১৯৪৮ সালের মে মাসে সিমলা হয়ে হিমাচল প্রদেশের চিনী উপত্যকার কিন্নরদেশে যান। সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অনগ্রসরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারের কাছে মূল্যবান 'নোট' পাঠান। গরমের পর প্রয়াগে আসেন। পরিভাষার কাজ ছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর 'আজ কী রাজনীতি' ও কিন্নরদেশ ভ্রমণের উপর 'কিন্নরদেশ' রচনা শুরু করেন।

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি প্রসারের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। শাসন শব্দকোষ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিভাষার কার্য পরিচালনা করেন। তিনি 'হিন্দিকোষ' রচনা ছাড়া 'তিব্বতী-হিন্দি কোষ' ও 'তিব্বতী-সংস্কৃত কোষ' তৈরি করেন। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের জন্য ইতিপূর্বে (১৯৩৯) শ্রীকাশী পণ্ডিত সভা তাঁকে 'মহাপণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সফর সেরে আবার কলকাতায় এসেছেন (২০ ডিসেম্বর ১৯৪৮)। সুনীতিবাবু ও বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ভাষাসমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপক বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের কথা বলেন। কলকাতার সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে এবং বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। 'কলকাতা শুধু বাঙলার রাজনৈতিক রাজধানী নয়, সাংস্কৃতিক রাজধানীও বটে। বাঙালীরা প্রথম আধুনিক তথা য়ুরোপের সংস্পর্শে আসে এবং বাঙালীরাই প্রথমে আমাদের মুক্তি ও প্রগতির পথ দেখায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী মনীষীরা য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেন এবং অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন, যা থেকে হিন্দি-ভাষীরা পঞ্চাশ বৎসর পিছিয়ে আছে।' কলকাতা থেকে রাহুল শান্তিনিকেতন যান 'বৌদ্ধসংস্কৃতি' পুস্তক রচনার তথ্য সংগ্রহের জন্য। চীনাভবনে রক্ষিত সামগ্রী বিশেষ সহায়ক হয় এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার থেকে প্রভূত সাহায্য করেন। পরে 'বৌদ্ধসংস্কৃতি' বইখানি তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

১৯০৫ সালে রাহুল কালিম্পঙ যান। সাহিত্য সহায়িকা হিসাবে কমলা পরিয়ারকে নিযুক্ত করেন। পরে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে উভয়ের বিবাহ হয় মুসৌরীতে। পুরোহিত ডঃ সত্যকেতু। কালিম্পঙ থাকার সময় তিনি 'দোর্জেলিঙ পরিচয়' রচনা শেষ করেন। তিনি হিমালয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন সময়ে লেখেন যা ভারতীয় ভাষার স্থায়ী সম্পদ।

কালিম্পঙ থাকার সময় তিব্বত-চীনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা আলোচনা শুরু হয়। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন রাহুল পুলিশের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক। বিদেশী সংবাদপত্রে এনিয়ে কথা উঠে। রাহুল তাঁর মনোভাব গোপন না করে "নবীন চীন স্বাগত', 'হামারা পড়োশী 'চীন' ইত্যাদি রচনার মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমার পূর্ণ সহানুভূতি চীনের প্রতি। আমি জানি তিব্বতের মঙ্গল চীনের সঙ্গে থাকলে, আর এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।' সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ যান সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। সেখানে রাহুলকে 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি দেওয়া হয়। এবার ঘরের খোঁজে কালিম্পঙ-নৈনিতাল হয়ে মুসৌরীতে ঘর বাঁধেন।

মুসৌরীতে থাকাকালীন তিনি সোভিয়েত দেশ থেকে আনীত মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের তথ্য পর্যালোচনা করেন এবং দুইভাগে বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন 'মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস'। এই পুস্তকের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ে ছোট ছোট গল্প রচনা করেন, পরে যা 'বহুরঙ্গী মধুপুরী' নামে প্রকাশিত হয়। ভ্রমণকাহিনী 'রুশ মেঁ পঁচ্চিশ মাস', 'তিব্বত মেঁ তীসরীবার' ও 'যাত্রা কে পন্নে' ইত্যাদি রচনা শেষ করে আবার কেদার-বদরীর দিকে যান।

১৯৫২ সালে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে তিনি খুশি হন। সামন্ত বাদের অবশেষ নিয়ে এই সময় একখানা উপন্যাস লেখেন 'রাজস্থানী রনিবাস'।

১৯৫৩ সালে রাহুল নেপাল যান। নেপালে রানাশাহী খতম হয়েছে। সাধারণ মানুষ নতুন নেপাল গড়ে তোলার কাজে লেগেছে। রাজা শাহী ?

১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ মস্কোতে স্তালিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হত। 'মার্কস্ যে-সাম্যবাদী দর্শন প্রচার করেছেন এবং পৃথিবীকে পরিবর্তন করার যে-পথ 'দেখিয়ে-

ছেন তাকে প্রতিষ্ঠা করতে লেনিন সফল হয়েছেন রাশিয়ায়। বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে সাম্যবাদের গোড়াপত্তন লেনিন করে গেছেন। আর স্তালিন সাম্যবাদী অর্থনীতিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহান সাফল্য এনেছেন। এটা আমার কাছে এক প্রেরণাদায়ক বার্তা।' রাহুল স্তালিনের এক জীবনী রচনা করেন। পরে মার্কস্‌বাদী চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি প্রচারের জন্য মার্কস, লেনিন ও মাও ৎসেতুঙের জীবনী রচনা করেন এবং মার্কস-বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন পুস্তক লিখতে শুরু করেন, যার প্রথম বই 'কমিউনিস্ট ক্যা চাহতে হৈঁ'।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে রাহুল আবার হিলাচল প্রদেশ সফর করেন।

১৯৩৪ সালে তিব্বত থেকে রাহুল আদি সিদ্ধ কবি সরহপাদের 'দোহাকোষ' (তিব্বতী অনুবাদ) সংগ্রহ করে আনেন। এইবার সেই দোহাগুলি সম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত দোহাকোষে সব দোহা নেই। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর দোহাকোষে তিব্বতী অনুবাদসহ মোট ১৩৪টি দোহা আছে। রাহুল যে-পুঁথি সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে ১৬৩টি দোহা আছে। কিছু অপভ্রংশ কবিতাও সেই সঙ্গে অনুবাদ করে এর সঙ্গে যোগ করে দেন। তারপর অক্টোবরে প্রয়াগে আসেন এবং দারাগঞ্জে হিন্দি কবি নিরালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাহুল দিল্লীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন এবং আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অজয় ঘোষ সাদরে স্বাগত জানালে ঐ দিনেই সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'এটা সকলেই জানে যে আমি পার্টি সদস্য না থাকলেও পার্টিরই লোক। আমার লেখার মধ্য দিয়ে সেই কাজই করে এসেছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাব। ঐ-দিনটা বড়ই আনন্দের। কারণ পার্টি সদস্যপদ ছাড়া আমার মহাপ্রয়াণ হয় নি। চিরকাল ধরে যে-আদর্শ পোষণ করে এসেছি তারই প্রতীক হচ্ছে পার্টি। এখন আমি সারাজীবনের জন্য পার্টিসদস্য থাকব।' কিছুদিন পর পার্টি-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে রাহুল সদস্যপদ পেয়েছেন। আর সেইদিনই ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করার দিন। আবার তিব্বত যাবার ইচ্ছা। উত্তরপ্রদেশ সরকার পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করছে। রাহুল রাষ্ট্রপতিকে এনিয়ে সহায়তা করার অনুরোধ জানান।

সাহিত্য রচনার কাজ চলেছে। বৈদিক যুগের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সপ্তসিন্ধু' ছাড়া 'শাদী', 'বিস্মৃতি যাত্রী', 'বচপন কী স্মৃতিয়া' ও 'ভারত মেঁ অংগ্রেজী রাজ্যকে সংস্থাপক' (ইংরাজী হতে অনুবাদ) প্রভৃতি রচনা শেষ করেন।

১৯৫৬ সালের গোড়ায় তিনি কলকাতায় আসেন। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য সেদিন হরতাল। ট্রেন মাঝপথে আটকা পড়ে গেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন না হলে জাতীয় সংহতি ও প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। নেহরুর মতে 'ভাষাবাদ নীচ মনোবৃত্তির দ্যোতক।' রাহুল এমত সমর্থন করেন না; কারণ 'যে নিজের মাতৃভাষাকে ভাল না বাসে সে সংস্কৃতিবিহীন ব্যক্তি। ভাষা শখের জিনিস নয়, এটা একটা বড় শক্তির দ্যোতক। যদি জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, যদি জনসাধারণকে শাসনকার্যের উপযুক্ত করে তুলতে হয় তবে তাদের ভাষা ছাড়া এক পাও এগোবার উপায় নেই।'

কলকাতায় তিনি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় গ্রন্থাগার এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

তিব্বতের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তিনি আগ্রহী। ১৯৪৯ সালে চীনে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্যবাদ তিব্বতেও প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন মঠে 'বন্দি' মূল্যবান পুঁথিপত্র এবার সহজভাবেই দেখা যেতে পারে। সেই আগ্রহ এবং নতুন চীনের প্রগতি প্রত্যক্ষ করার বাসনা নিয়ে চীনা বৌদ্ধ সংঘের আমন্ত্রণক্রমে তিনি ১৯৫৮ সালের ১৫ জুন কলকাতা থেকে চীন অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই দিনই রেঙ্গুনে পৌছান। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ থাকেন এবং বিভিন্ন মঠ ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন। সাহিত্যসভায় ভাষণও দেন। বর্মায় রাহুল অপরিচিত নন কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর 'ভোলগা থেকে গঙ্গা', 'বৌদ্ধদর্শন', 'সিংহসেনাপতি' ইত্যাদি পাঁচখানা বই বর্মী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

২৩ জুন রাহুল পিকিঙ পৌছান। বিমানবন্দরে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। পিকিঙে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান তথা মঠ ও বৌদ্ধ সংঘ পরিদর্শন করে মাঞ্চুরিয়ায় যান। ১৯৩৫ সালে রাশিয়া যাবার সময় এখানে প্রায় এক মাস ছিলেন। নতুন ও পুরাতনে আকাশপাতাল প্রভেদ। মুকদেনে হেভি মেসিন টুল কারখানায় গিয়ে

সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, আন্‌শান্‌ শিল্পনগরীতে নতুন চীনের শিল্পপ্রগতি প্রত্যক্ষ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। পিকিঙে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেষট্টি বছর বয়সে হার্টের অসুখ মারাত্মক হতে পারে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে সুস্থ হয়ে চীনের অজন্তা তুয়াং হোয়া গুহামন্দির পরিদর্শন করতে যান। ১ অক্টোবর জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও উৎসবে অংশ নেন। চীনের বিভিন্ন কম্যুন পরিদর্শন করে কৃষি প্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। এ-বিষয়ে তিনি 'চীন মেঁ কম্যুন' বইতে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পিকিঙ থেকে বিদায় নেবার আগে অখিল চীন বৌদ্ধ সংঘর সভাপতি গেশোরব (প্রজ্ঞাসাগর)-এর সঙ্গে দেখা হয় ১৯ অক্টোবর। পূর্বে দু'বার তিব্বত-যাত্রার সময় লাসায় তাঁর সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হয় এবং এঁরই সহায়তায় ধর্ম-কীর্তির 'বাদন্যায়'-এর শান্তরক্ষিত কৃত টীকার ফটো নিতে সক্ষম হন। তিব্বত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গেশোরব নতুন চীনের প্রতি অনুরাগী এবং সহজভাবেই বুঝেছেন তিব্বতের উন্নতি ও প্রগতির অপূর্ব সুযোগ এসে গেছে। এ-যাত্রায় রাহুলের তিব্বত যাওয়া হল না। নানকিঙ-সাংহাই-ক্যান্টন হয়ে ১০ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছান। চীনভ্রমণ নিয়ে তিনি 'চীন মেঁ ক্যা দেখা' পুস্তক রচনা করেন।

১৯৫৯ সনে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তিব্বতে সামন্তপ্রভুরা বিদ্রোহ করে। চীনা ফৌজ তার মোকাবিলা করে। দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রে নানা আলোচনা চলতে থাকে তিব্বতের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পরে দলাই লামা লাসা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। রাহুল তিব্বতের ইতিহাস সম্বন্ধে একজন সর্বজনস্বীকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এ-ব্যাপারে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় লেখেন—'তিব্বতের ইতিহাস এই কথাই বলে দশম শতাব্দী থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত যখন চীন একতাবদ্ধ ছিল তখন তিব্বত চীনের ছত্রছায়ায় ছিল। তিব্বতে দলাই লামার শাসন ১৬৪০ সালের কাছাকাছি সময় স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকে চীনে গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা (১৯১১) হওয়া পর্যন্ত চীনা প্রতিনিধি অম্বন তিব্বতের শাসনকার্য পরিচালনা করত। আমাদের সার্ভেয়ার নৈন্‌সিংহ ও কিষন সিংহের ১৮৬২ সালের এবং পরের যাত্রাবিবরণী পড়ুন, দেখবেন তিব্বত-সীমানা বরাবর এবং রাজধানী লাসায় চীনা সেনা ও অফিসারের উল্লেখ আছে। প্রথম যাত্রার সময় তিব্বতী সেনা

নেপাল থেকে কৈরোং-এর রাস্তা দিয়ে যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে, নৈন্‌সিংহ চীনা সেনাপতির কাছে আবেদন করে। যখন সেও অস্বীকার করে তখন অন্য রাস্তা ধরতে হয়। এতদূর যাবার দরকার নেই। ১৯০৩/৪ সালের জাপানি যাত্রী কাওয়াগুচীর যাত্রাবিবরণী পড়ুন। তাতেও স্থানে স্থানে চীনা সেনার উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে। মাঞ্চু শাসনের শেষ সময়ে যখন দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন সেই সুযোগে ইংরাজ সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এবং শেষে ১৯০৪/৫ সালে ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে সেখানে পাঠানো হয়। রুশের সঙ্গে গণ্ডগোল হবার ভয়ে তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য দুই দেশই স্বীকার করে নেয়। ১৯১১ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চীন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সময় ইংরাজ ও অন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চীন ও তিব্বতের পুরাতন সম্পর্ক নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে। ইতিহাস তো এই কথাই বলে।'

'১৯৪৮-৪৯ সালে তিব্বতের সামন্তরা এই চেষ্টাই করেছিল যাতে তিব্বত চীনের অধীন না হয়। তারা নিজেদের প্রতিনিধি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিব্বতের প্রভুরা চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। চীন তিব্বতকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেয় এবং তৎকালীন তিব্বত সরকার চীনের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। তিব্বতে চীনা সরকার অধিকতর উদারতার সঙ্গে কাজ করে। ১৯৫১ সালের মধ্যে চীনের সব জায়গায় ভূমিসংস্কার কার্যকরী হয়। জমির উপর কৃষকের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়। জমিদারি প্রথা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিব্বতে ভূমিসংস্কারের নামও করা হয় না।'

'তিব্বতের ভূমিব্যবস্থা সাধারণ অর্থে জমিদারি প্রথা নয়, পরন্তু সামন্ত অর্ধদাস প্রথা। জমি ও কৃষক—এই দুইয়ের উপর ভূমিপতির পূর্ণ অধিকার। ভূমিপতি নিজের অর্ধদাস কৃষককে প্রাণে মারা ছাড়া বাকি সবকিছু করার অধিকার রাখে। ভূমিপতির ঘরে কৃষকের ছেলেমেয়েরা সারা বছর বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটে। প্রায় অনাহারেই কাজ করতে হয়।'

'এই রকম জঘন্য ভূমিব্যবস্থার উপর চীনা রাজনীতিজ্ঞরা এই জন্যই আক্রমণ করে নি যাতে তিব্বতের সামন্তরা নারাজ হবার সুযোগ পায়। তিব্বতের সমগ্র জমির প্রায় তিনভাগ মঠ আর মোহান্তদের আর বাকি একভাগ গৃহস্থ সামন্তদের। মোহান্তদের মধ্যেও অনেক সামন্তদের ছেলে আছে। এদের এই অধিকারকে

অক্ষুণ্ণ রাখা জনসাধারণের হিতের বিরুদ্ধ। কিন্তু চীনারা বুঝেছিল এখনি কিছু করলে সাধারণ লোক সামন্তদের ঘাবড়িয়ে দেবে। অকারণ রক্তপাত হবে। তাই চীনারা রাস্তা তৈরি, শিক্ষা প্রসার ও খনিজ অনুসন্ধান কাজ শুরু করে।'

'চীনে সমস্ত কৃষক ইতিমধ্যে কম্যুনে সংঘটিত হয়েছে, কৃষি ও শিল্পবিকাশের সাথে সাথে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এর প্রভাব তিব্বতের উপর না পড়ে কি থাকতে পারে? ভূমিপতি ও সামন্তরা ভাবতে থাকে এই রকম দিন তাদেরও দেখতে হবে। যদি তরুণেরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয় তবে হাতিয়ার উঠাবার সময় চলে যাবে, সেইজন্য তারা এই চেষ্টা করে।'

'এখনো সমগ্র জনতা এতটা বুঝে উঠতে পারে নি যাতে নিজেদের হিত বুঝে সামন্তদের স্বার্থ থেকে নিজেদের পৃথক রাখে। দলাই লামার উপর জনতার বিশ্বাস আছে। কিন্তু এটা এক প্রকার অন্ধ বিশ্বাস। সাম্রাজ্যবাদী এবং তার অনুচরেরা যতই কাগুজে তরবারি চালাক, তারা তিব্বতী জনসাধারণের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এখন ওখান থেকে সামন্তবাদ শেষ হয়েই যাবে। প্রথমে কিছুটা দেরি হলেও এখন সেই কাজ দ্রুততর হবে। আমাদের এখানকার কিছু নেতা তিব্বতের সামন্তপ্রভুদের এই বিদ্রোহকে তিব্বতী জনতার বিদ্রোহ তথা জাতীয় অভ্যুত্থান বলছে। সামন্তদের এই বিদ্রোহ জলের বুদ্বুদের মত। মিলিয়ে যেতে বেশি দেরি হবে না।' ('চীন মেঁ ক্যা দেখা', ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২/৩)

চীন যাবার আগে রাহুল মুসৌরীর বাড়ি বিক্রি করে দেন। এবার দার্জিলিংে একটা বাড়ি কেনেন। সিংহল থেকে আবার আমন্ত্রণ এসেছে। বিদ্যালঙ্কার পরিবেন এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। রাহুল সেখানে দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে পৌছান। প্রায় দু' বছর অধ্যাপনার পর ১৯৫৯ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং দার্জিলিংে নিজের বাড়িতে উঠেন।

ডিসেম্বরে কলকাতায় কিশোরীদাস বাজপেয়ীর অভিনন্দন সভায় যোগ দিতে আসেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরে স্মৃতি লোপ পায়। কলকাতায় সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, পরে কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায় রাশিয়ায় পাঠান হয়। সেখানে প্রায় সাতমাস চিকিৎসা-

ধীন থাকেন। ভারত সরকার এতদিন রাহুলকে বিশেষ কোনো সম্মান প্রদর্শন করে নি। স্মৃতি লোপ পাবার পর রাহুলকে পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান করা হয়। ২৩ মার্চ ১৯৫৯ সালে রাহুল রাশিয়া থেকে দার্জিলিঙ ফিরে আসেন। ৯ এপ্রিল এই অবস্থার মধ্যেই ৭০তম জন্মদিবস পালিত হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৫৯ সালে বেলা সাড়ে এগারটায় হিমালয়-প্রেমী সাম্যবাদী রাহুল হিমালয়ের কোলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন।

রাহুল প্রায় দেড়শটি পুস্তকের লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক। তিব্বত থেকে ছোট বড় প্রায় সাড়ে তিনশ পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন যার মধ্যে বহু লুপ্ত গ্রন্থও আছে। সেই আবিষ্কারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে জায়সওয়াল লিখেছিলেন—'বিদ্বৎ-সমাজ এই আবিষ্কারের নাম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অপার শ্রদ্ধা বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।' চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে বলেন—'রাহুলের মধ্যে আমি যেন বুদ্ধেরই প্রকাশ দেখতে পাই, হিংসা দ্বেষ তাঁহার নিরুদ্বেগ চিত্তকে স্পর্শও করতে পারে নি। তিনি সতত প্রশান্ত সৌম্য ও সুধীর, তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন।' আর নিজের ভাষায়—'বিদ্যা ও কাল মিলে মানুষকে অধিকতর উদার করে তোলে। আমি কোনো এক সময় বৈরাগী ছিলাম, পরে আর্যসমাজী হয়েছিলাম, বৌদ্ধ ভিক্ষুও হই, আবার বুদ্ধের উপর শ্রদ্ধা রেখেও মার্কসের শিষ্য হয়েছি।' মানব সংসারে রাহুল সাংকৃত্যায়ন চিরভাস্বর স্বর্ণতারকা।

দীর্ঘ সত্তর বছর ছ'দিনের বৈচিত্র্যময় জীবনে রাহুলজী কত বই রচনা, সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন এ-জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। তাই এখানে রাহুলের বিভিন্ন রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক অবলম্বনে প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পঞ্জী পাঠকদের সামনে রাখছি। রাহুলজীর রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত—সর্বাধিক মোট দেড়শটি। কিছু বাদ পড়া অস্বাভাবিক নয়।

এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শতাধিক লেখা ও ভাষণ আছে যা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। ১৯৬১ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখা রোজনামচা এবং বহু চিঠিপত্র আছে। জীবনযাত্রার শেষ খণ্ডও প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

রাহুলের চারবার তিব্বত যাত্রায় আবিষ্কৃত পুঁথির সংখ্যা ৩৬৮ এবং ৫৫টি পুঁথির আলোকচিত্র তিনি তুলে এনেছেন, যার মধ্যে ৯টির অনুলিপি করে এনেছেন। এসবের বিবরণ রাহুল নিজে 'Journal of the Bihar and Orissa Research Society'-র পত্রিকায় ১৯৩৫, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে দিয়েছেন। এই সব মূল্যবান পুঁথির কিছু এবং বহু তিব্বতী চিত্রপট ও অন্যান্য দ্রব্য বর্তমানে পাটনা যাদুঘরে 'রাহুল বিভাগে' সংরক্ষিত আছে।

সমাজ, রাজনীতি

১। সাম্যবাদ হী ক্যোঁ? ২। দিমাগী গুলামী ৩। রাহুলজী কা অপরাধ ৪। তুম্হারী ক্ষয় ৫। ক্যা করেঁ ৬। মানব সমাজ ৭। বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ ৮। ভাগো নহীঁ, দুনিয়াকো বদলো ৯। আজ কী সমস্যাএঁ ১০। আজ কী রাজনীতি ১১। কমিউনিস্ট ক্যা চাহতে হৈঁ ১২। রামরাজ আউর মার্কসবাদ ১৩। ভারত মেঁ অংগ্রেজী রাজ্যকে সংস্থাপক (অনুবাদ) ১৪। মানব কী কহানী

গল্প

১। সত্‌মী কে বচ্চে ২। ভোলগা সে গঙ্গা ৩। বহুরঙ্গী মধুপুরী ৪। কনৈলা কী কথা ৫। রূপী ৬। মধুপুরী ৭। আজমগড় কী পুরা কথা

নাটক

(সবগুলি ভোজপুরী ভাষায় লিখিত)

১। জাপনিয়া রাছছ ২। জার্মানওয়াকে হার নিহিচয় ৩। দেশ রচ্ছক ৪। ই হমার লড়াই ৫। ঢুনমুন নেতা ৬। তিন নাটক ৭। মেহারারুনকে দুরদশা ৮। নইকি দুনিয়া

দেশপরিচয়, ভ্রমণকাহিনী

১। তিব্বত মেঁ সওয়া বরস ২। ইরান ৩। মেরী লদাক যাত্রা ৪। লঙ্কা ৫। মেরী তিব্বত যাত্রা ৬। মেরী য়ুরোপ যাত্রা ৭। জাপান ৮। সোভিয়েত ভূমি ৯। কিন্নরদেশ ১০। দোর্জেলিঙ পরিচয় ১১। যাত্রাকে পন্নে ১২। রুশ মেঁ পঁচ্চিস মাস ১৩। গড়বাল ১৪। এশিয়া কে দুর্গম ভূখণ্ড মেঁ ১৫। কুমাউঁ ১৬। চীন মেঁ কম্যুন ১৭। চীন মেঁ ক্যা দেখা ১৮। জৌনসার দেরাদুন ১৯। নেপাল ২০। হিমাচল প্রদেশ ২১। তিব্বত মেঁ তীসরীবার ২২। ঘুমক্কড় শাস্ত্র (ভ্রমণ প্রস্তুতি বিষয়ক) ২৩। যাত্রাবলী (প্রথম ভাগ)

ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান

১। ইসলাম ধর্ম কী রূপরেখা ২। পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী ৩। দর্শন দিগ্‌দর্শন ৪। সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ৫। অতীত সে বর্তমান ৬। মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস (দুই খণ্ডে) ৭। আকবর ৮। ঋগ্বৈদিক আর্য ৯। বিশ্ব কী রূপরেখা

বৌদ্ধ সংস্কৃতি

১। বুদ্ধচর্যা ২। তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম ৩। বৌদ্ধদর্শন ৪। বৌদ্ধসংস্কৃতি ৫। মহামানব বুদ্ধ ৬। বৌদ্ধধর্ম ক্যা হৈ ? ৭। বুদ্ধ কা অনাত্মবাদ

উপন্যাস

১। বাইসবীঁসদী ২। জাদুকা মুল্ক ৩। শৈতান কি আঁখ ৪। বিস্মৃতি কে গর্ভ মে ৫। সোনে কী ঢাল ৬। জীনে কে লিয়ে ৭। সিংহ সেনাপতি ৮। জয় যৌধেয় ৯। মধুর স্বপ্ন ১০। রাজস্থানী রনিবাস ১১। বিস্মৃত যাত্রী ১২। দিবোদাস ১৩। শাদী

জীবনকথা, স্মৃতিচিত্র ও আত্মকথা

১। নয়ে ভারত কে নয়ে নেতা ২। সরদার পৃথ্বীসিংহ ৩। মেরী জীবনযাত্রা (পাঁচ খণ্ডে) ৪। স্তালিন ৫। লেনিন ৬। বচপন কী স্মৃতিয়াঁ ৭। কার্ল মার্কস্ ৮। মাও ৎসেতুঙ ৯। জিনকা মৈঁ কৃতজ্ঞ ১০। মেরে অসহযোগ কে সাথী ১১। বীর চন্দ্রসিংহ গড়বালী ১২। ঘুমক্কড় স্বামী হরিশরণানন্দ ১৩। সিংহল ঘুমক্কড় জয়বর্ধন ১৪। সিংহল কে বীর ১৫। কপ্তান লাল ১৬। জয় জেতা কে পর

সাহিত্য

১। সাহিত্য নিবন্ধাবলী ২। হিন্দি কাব্যধারা ৩। সংস্কৃত কাব্যধারা ৪। দক্ষিণী-হিন্দি কাব্যধারা ৫। পালি সাহিত্যকা ইতিহাস ৬। পালি কাব্যধারা

ভাষাশিক্ষা ও কোষগ্রন্থ

১। তিব্বতী পাঠবলিয়াঁ (তিন খণ্ডে) ২। তিব্বতী বালশিক্ষা ৩। তিব্বতী ব্যাকরণ ৪। সংস্কৃত পাঠমালা (পাঁচ খণ্ডে) [১৯২৭/২৮ সালে সিংহলী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের পরিবর্ধিত হিন্দি রূপ] ৫। সিংহল ভাষা ৬। শাসন শব্দকোষ ৭। রাষ্ট্রভাষা কোষ ৮। তিব্বতী-হিন্দি কোষ ৯। তিব্বতী-সংস্কৃত কোষ

পালি, সংস্কৃত হতে অনুবাদ ও সম্পাদনা

১। বসুবন্ধুকৃত অভিধর্মকোষ ২। ধম্মপদ ৩। মজ্ঝিমনিকায় ৪। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি (চীনা হতে সংস্কৃত)* ৫। বিনয় পিটক ৬। প্রজ্ঞাকর গুপ্তকৃত প্রমাণ বার্তিকভাষ্য (অংশত) ও বার্তিকালঙ্কার (প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ)* ৭। বাদন্যায় শান্তরক্ষিত বৃত্তি* ৮। দীঘনিকায় (জগদীশ কাশ্যপসহ) ৯। মাতৃচেটকৃত অর্ধ্যর্দ্ধ-

শতক (কে পি জায়সওয়ালসহ)* ১০। নাগার্জুনকৃত বিগ্রহ ব্যবর্তনী (জায়-সওয়ালসহ)* ১১। ধর্মকীর্তিকৃত প্রমাণবার্তিকম্* ১২। মনোরথ নন্দীকৃত প্রমাণ-বার্তিক (বৃত্তিসহ)* ১৩। প্রমাণবার্তিক কর্ণকগোমী বৃত্তি ও স্বোপজ্ঞ বৃত্তিসহ ১৪ প্রজ্ঞাকরগুপ্তকৃত প্রমাণবার্তিকভাষ্য ১৫। দীর্গাগমস্য সূত্রদ্বয়ম্ ১৬। খুদ্দক-পাঠ ১৭। গুণপ্রভকৃত বিনয়সূত্র ১৮। মজ্ঝিমনিকায় (ক) পন্নাসকম্ (খ) উপরি পন্নাসকম্ (দেবনাগরী লিপিতে) ১৯। হেতুবিন্দু ২০। সম্বন্ধ পরীক্ষা ২১। নিদান পরীক্ষা ২২। মহাপরিনির্বাণসূত্র ২৩। সূত্রকৃতাঙ্গ ২৪। যোগাচারভূমি

বিদেশী ভাষা হতে অনুবাদ ও অন্যান্য সম্পাদনা

১। দাখুন্দা ২। অনাথ ৩। জো দাস থে ৪। অদিনা ৫। সুদখোর কী মৌত। (সবগুলি সদরুদ্দীন আইনীর তাজিক উপন্যাস হতে অনুবাদ) ৬। সোভিয়েত কী ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টিকা ইতিহাস (দুই খণ্ডে) [স্তালিন] ৭। সোভিয়েত ন্যায় আউর রাদেক আদিকা মুকদমা [কোলর্ড ডাড্‌লে] ৮। গাঁও কে গরীবোঁ সে [লেনিন] ৯। কম্যুনিস্ট ঘোষণা [মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স] (আচার্য নরেন্দ্রদেব-সহ) ১০। আদি হিন্দি কী কহানিয়াঁ আউর গীত [রমনমাই কথিত] ১১। দোহা-কোষ [সরহপাদকৃত] ১২। তুলসী রামায়ণ (সংক্ষিপ্ত) ১৩। হিন্দি লোকসাহিত্য ('হিন্দি সাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস'-এর ষোড়শ খণ্ডের সম্পাদনা) ১৪। 'গঙ্গা' পত্রিকা, পুরাতত্ত্বাংক (সম্পাদনা)

বাংলা অনুবাদে রাহুল-সাহিত্য

১। মানব সমাজ ২। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ৩। ভোলগা থেকে গঙ্গা ৪। নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর ৫। ভোলগা থেকে গঙ্গা (কনৈলা কী কথা) ৬। জয় যৌধেয়† ৭। অগ্নিস্বাক্ষর (মধুর স্বপ্ন) ৮। সিংহ সেনাপতি ৯। কিন্নর দেশে ১০। পুরনো সেই দিনের কথা (সত্‌মী কে বচ্চে) ১১। সপ্তসিন্ধু (দিবোদাস) ১২। উত্তরাংশ (জীনে কে লিয়ে) ১৩। স্মৃতির অন্তরালে (বিস্মৃতি কে গর্ভ মেঁ) ১৪। বিস্মৃত যাত্রী ১৫। নতুন মানব সমাজ (তুম্‌হারী ক্ষয়)† ১৬। বুদ্ধদর্শন

* Journal of the Bihar and Orissa Research Society-তে প্রকাশিত।

† বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স
প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

হাওয়ার্ড ফাস্ট

স্পার্টাকাস

অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বের একুশটি প্রগতিশীল গল্পের সংকলন

আন্তর্জাতিক

প্রতিবাদের গল্পসংগ্রহ

সম্পাদনা : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

চল্লিশ-দশকের নৌ বিদ্রোহের প্রামাণ্য দলিল

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস

দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সংবলিত

ম্যাক্সিম গর্কি

আর্তামোনোব কাহিনী

অনুবাদ : সত্যপ্রিয় বড়ুয়া